পার্থিব পৃথিবীতে

শ্রীকালিকানন্দ ব্রহ্মচারী

১৯৬৪
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌
কলকাতা

মুদ্রক ও প্রকাশক :
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌
[পরিবেশক : বুক সারভিস প্রাঃ লিঃ]
৫৫-১, কলেজ ষ্ট্রীট, তেতলা,
কলকাতা-১২

উৎসর্গ

কল্যাণীয় শ্রীমান তারাপদ

ও

কল্যাণীয়া শ্রীমতি যূথিকা

স্নেহভাজনেষু

"বিশ্রাম"
১নং মিড্‌ল রোড,
কালিয়া নিবাস,
ব্যারাকপুর।

শ্রীকালিকানন্দ ব্রহ্মচারী

ভূমিকা

পরমভাগবৎ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ হতে :

শ্রীকরমা বাই, শ্রীঅর্জুন মিশ্র, শ্রীবিল্বমঙ্গল মহাশয়, শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ, শ্রীনামদেবজী, শ্রীবাঁকা পতি রাকা স্ত্রী, মীরা বাঈ, শ্রীতুলসীদাস মোহান্ত এই জীবনী ক'টি এক বিশেষ অনুপম ভঙ্গীতে...বাংলা-সাহিত্য আসরে ...সাজিয়ে দিয়েছি।

এর সাথে জীবকল্যাণের অ-নেক কথা.. যা আমার সংগ্রহের মধ্যে ছিল—তা-ও, পরিবেশন করেছি।

শ্রীকালিকানন্দ ব্রহ্মচারী

[এক]

আমি মায়ায় পড়ে গেলাম।

আচার্য্য জীবনানন্দ মহারাজের কাছে এসেছিলাম—আমারই নিজের জীবনের কিছু-কয়টি প্রশ্নের সমাধানের জন্যে।

সে সুযোগ আচার্য্যদেব আমায় দিলেন না।

তাঁর বহু-সাধের আশ্রমটি দিয়ে গেলেন আমায়। বলে গেলেন, তুমি কেন অনেকগুলো দিনের পরে আবার আমার আশ্রমে এলে, তা আমি জানি কিন্তু! আর আমি জানতামও তুমি আসবে।

আচার্য্য-কন্যা মনোমালা ছিল দাঁড়িয়ে আমার সামনে। আমি আচার্য্যদেবের কথার কোনো উত্তর দিতে পারিনি।

তিনি শুধু একটু হেসেছিলেন মাত্র।

সবে ভোর হয়েছে।

সারারাত একটি ভাবনায় ক্লান্ত হয়েছিলাম। ক্লান্ত হওয়ার কারণ ছিলেন স্বামীজী। তাঁর লেখায় যে পড়েছিলাম: যতক্ষণ তুমি না পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা, অরণ্য, বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্মল করিতে পার, তবে তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে।

আশ্রম জীবনের 'অভ্যাস'-টিও আজ আর আমাতে নেই। জাগাই ছিলাম। লজ্জা হচ্ছিলো বড্ড। অথচ বিছানা ছেড়ে উঠতেও মন চাইছিলো না।

: আসতে পারি ?

মালার কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম বিছানায়। মেরুদণ্ডটি সোজা করে জপ করার ভঙ্গীতে চোখের দৃষ্টি দুটো 'নামিয়ে' দিলাম।

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই প্রবেশ করলো মালা।—আপনি জপে বসেছেন ?

মালা চলে যাচ্ছিলো—

(এ সব আমার জীবনের অনেক পুরানো অতীত-কথা।)

ব্যথা-বোধ একটি হঠাৎ ঘুমভাঙা ছোট্ট শিশুর মতো আমায় কাঁদিয়ে দিলে। থামিয়ে ছিলাম মালাকে। কথা একটি বলতে হয়—তাই বললাম : তোমার স্নান হয়ে গেছে, না ?

আশ্রম জীবনে যখন ছিলাম, বেশ ছিলাম যেন। বার বার এই কথাই মনের অতল হতে ভুস্ করে ভেসে উঠছিলো। কিন্তু প্রবোধ দিতে হলো মনকে—নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে।

মালাকে ঠকাতে গেলাম কেন ? মালা যদি আমায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখতো বা শোয়া ভাবে জাগা অবস্থায় দেখে ফেলতো, কী এমন ক্ষতি হতো আমার ?

চুপ-চুপ আমার মনটি মালাকে অনুসরণ করে চললো। কিছু সময় পড়ে রইলাম। অনুশোচনায় তখন আমি ভারাক্রান্ত।

* * * *

আশ্রম মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। অ-স্নাত অবস্থায় মন্দিরে উঠবো কি-না ভাবছি, শুনতে পেলাম : দ্বিধা কেন ? সাথে সাথে মালাকেও দেখতে পেলাম। তার চোখ দুটিতে—ভরা যৌবনের ঐশ্বর্য্য অনেকখানি নত হয়ে আমায় আহ্বান জানালো।

আমি তখন বেশ কিছু 'অস্থির' হয়েছি বইকি !....হয়তো এমনই হয়। আশ্রম জীবন ছেড়ে যদি চলে না যেতাম, যদি মালা হতে বহুদিন 'দূরে' না থাকতাম........

: এক ভক্ত-কাহিনী শুনুন।—পরক্ষণেই আবার বললে—পাপ-অপাপ সে আমি দেখে নেব, মন্দিরের বারান্দায় উঠে আসুন তো!

মালা ডাকছে। আমি 'না' বলতে পারি না। অথচ—সাহস এসেও আমায় আশ্রয় করছে না। করি কী? এই দোটানায় তখনও আমি দাঁড়িয়ে—।

মালা মন্দিরে প্রবেশ করলে। বাইরে যখন এলো, দেখলাম—মালার হাতে পুঁথি একটি।

নেমে এলো। একেবারে আমার পাশটায় দাঁড়ালে। কাণের কাছে মুখ এনে বললে : দেখবেন! ছুঁয়ে ফেলবেন না যেন!

: যদি ছুঁই—?

: সে আপনি পারবেন না। মনের সে প্রেম-ভক্তি এখন আর আপনাতে নেই। আশ্রম ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আপনিও 'শূন্য' হয়ে গেছেন।

কথাটি শেষ করে—ঐখানেই বসে পড়লে মালা। মনোমালা আচার্য্য জীবনানন্দ মহারাজের কন্যা।

কচি-কচি দূর্বা ঘাসের বুকে আমিও বাধ্য হলাম বসতে। এখানটায় দূর্বা ঘাসের চাষই করেছিলাম বলতে হয়। তবে, আমি একা নয়। এতে মালারও পরিশ্রম ছিল অনেক। এখনও আছে। ....এখনও তো আর আমি নেই। ছিলাম না তো! এইতো ক'দিন এসেছি সবে।

আচার্য্যদেবের ভঙ্গীতে পুঁথির কয়টা পাতা উলটেই বললে : আর একটিও কথা নয় কিন্তু! আমি পড়ে চলি, আপনি শুনে চলুন।

"মাড়োয়াড় দেশীয় শ্রীজগন্নাথভক্ত।
করমা বাই নামেতে জগতে আছে ব্যক্ত॥
যাহার খিচুড়ী হরি খাইয়া পিরীতে।
করমা-বাই খিচুড়ী যে অদ্যাপি বিদিতে॥"

—করমা বাই উঠতেন খুব ভোরে। বাসি মুখে বসে যেতেন

শ্রীজগন্নাথ প্রভুর ভোগ রান্না করতে। কোনদিনই নিত্য-নূতন নানা রকম ব্যঞ্জনাদি রান্না করতেন না। প্রতিদিনই রান্না হতো খিচুড়ী। তাঁর খিচুড়ী রান্নার উপকরণ ছিল, আদা, লঙ্কা, হিং ও প্রচুর পরিমাণে গব্য ঘৃত। রান্না-শেষে পাখার বাতাসে ঠাণ্ডা করতেন।... নিবেদন করতেন শ্রীজগন্নাথ প্রভুকে।....তারপর মুখ ধুয়ে বাসি কাপড় ছেড়ে প্রবেশ করতেন সংসারের কাজে।

এইদিন তাঁর নিয়ম। প্রতিটি দিনের নিয়ম।

একদিন ভক্ত-বৈষ্ণব এক সাধু এলেন। অতিথি হলেন করমা বাইর। করমা বাইর রতি প্রেমে মুগ্ধ হয়ে রয়ে গেলেন। পরের দিন ভোরেই দেখতে পেলেন করমা বাইর 'নিয়মাবলী'।

"এত ভাবি বাইজীকে কহে কিছু নীত।
আচার পূর্ব্বক কৃষ্ণ সেবা যে উচিত।।"

করমা বাই ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন—

"স্ত্রী জাতি মুঞি না জানি কি মত করিব।"

এতকাল অপরাধ করে এসেছেন; আর নয়। পরের দিন হতেই পালটিয়ে দিলেন 'নিয়ম'। কিন্তু—

মন তো খুসীতে ভরে উঠলো না। অনেক বেলা যে হয়ে গেল প্রভুকে খাওয়াতে! প্রভুর কষ্ট হয়নি তো?

"অধিক বেলাতে জগন্নাথ খাওয়াইতে।
মনক্ষোভ হৈল সুখ না জন্মিল চিতে।।"

ওদিকে নীলাচল ধামেও ভোগ নিবেদন করা হয়ে গেছে। করমা বাইর দুয়ার হতে তাড়াতাড়ি ফিরতে হলো শ্রীজগন্নাথ প্রভুকে।

"আচমন না করিয়া তড়িঘড়ি গিয়া।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া।।"

নীলাচলের সেবক মহাজনেরা শ্রীজগন্নাথ প্রভুর বিগ্রহের দিকে কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।....এক এক করে সবার চোখে ভেসে উঠলো—শ্রীজগন্নাথ প্রভুর হাতে-মুখে খিচুড়ী লেগে রয়েছে যেন (?)—

"কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ী খাইলে গিয়া।
কোন ভাগ্যবান গৃহে চরণ অর্পিয়া ॥"

স্বপ্নাদেশ দিলেন শ্রীজগন্নাথ প্রভু। সেদিন রাত্রেই—

"নিত্য মৃঞি যাই করমা বাইর সদনে।"

আরো বললেন প্রভু: বেশ ছিল করমা বাই। রোজ সকাল সকালই আমায় খেতে দিত। অমুক বৈরাগী এসেছিল আমার ভক্তের কাছে—

"নীত শিখাইল তারে আচার করিতে।"

এই হেতু বেলা হয়। ক্ষিদেতে কষ্ট পাই আমি।

"সেখানে সুস্বাদু আর বাইয়ের পিরীতে।
ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত যাইতে ॥
সেথা হেথা ছুটাছুটি না পারি করিতে।
অতএব তার কাজ নাহি আচারেতে ॥"

—তোমরা আমার ভক্তকে সংবাদ পাঠিয়ে দাও—

"পূর্ব্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত।
তেমতি করিয়া করে তাহে মৃঞি প্রীত ॥"

এতোটা পড়া শেষ হলে, মালা আমার মুখের দিকে চাইলে। আচার্য্য-কন্যা মনোমালা।

আমি তো মালার দিকেই চেয়ে ছিলাম। দেখলাম: মালার চোখের মধ্যে ভাব-ঘন আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

চোখ নামিয়ে নিলে মালা। আবার আরম্ভ করলে পড়তে—

ভক্তের মহিমায় আনন্দ সাগরে ভেসে পরমভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ লিখে গেছেন:

"আহা কি আশ্চর্য্য দেখ কৃষ্ণ যার প্রীত।
তাহার মহিমা বেদ বিধি অবিদিত ॥

কোটি গঙ্গা তুল্য সেই সুপবিত্র হয়।
তার সাক্ষী দেখ যে জগন্নাথ কহয় ॥
অপেক্ষা না কৈলে শুচি পিরীতি পাইল।
যেহেতুক পিরীত পূর্ব্বক খাওয়াইল ॥
অতএব পিরীতি যাহার দেহে হয়।
বেদবিধিবিচারকিঙ্কর সেই নয়।"

এখানটায় মানসিক ধাক্কা পেলাম আমি। আপনা-আপনি মালা হতে আমার দৃষ্টি সরে এলো। আমি—আমার চিন্তা-পথের দরজাটি খুলে দিতে বাধ্য হলাম।

মালার মধ্যে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি-না, তা আমি আদৌ বুঝতে পারিনি।—

মনোমালা তো পুঁথি হতে পড়েই চলেছে—

—শ্রীজগন্নাথ প্রভুর সেবকদের মধ্য হতে একজন রওনা হয়ে গেলেন করমা বাইর উদ্দেশ্যে।

করমা বাই শুনলেন সব।

"বাইজী শুনিয়া মহা আনন্দে ভাসিল।
বিকার সাত্ত্বিক অষ্ট শরীর হইল ॥
পূর্ব্ববৎ প্রাতে উঠি খেচরান্ন করি।
জগন্নাথে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি ॥"

করমা বাইর প্রতি শ্রীজগন্নাথ প্রভুর আশীষ-ধারা-কথা....দিনে দিনে বহুদিকে লোক মুখে প্রচার হয়ে গেল।

"আচার করিতে যে বৈরাগী যুক্তি দিলা।
বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি ভয়েতে কাঁপিলা ॥"

—ছুটে এলেন ভক্ত-বৈষ্ণব সাধু মহারাজ—

"তোমার মহিমা আর প্রভুর আশ্রয়।
আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয় ॥

তোমারে কহিনু মূঞি আচার করিতে।
তাহাতে পাইয়া দুঃখ ক্রোধ হইল চিতে॥
অতএব আছয়ে তোমার যে নিয়ম।
সেইমত কর তাহে না কর হেলা॥"

আরও হয়তো পুঁথিতে লেখা ছিল কিছু কিন্তু, মালা পড়লে না তা। বন্ধ করে দিলে পুঁথি। উঠে দাঁড়ালো।

চমকিয়ে উঠলাম আমি। এ—কি! মালা যেন আমায় প্রণাম জানাতে উদ্যত হয়েছে।

আমার দেহ কেঁপে উঠলো বেশ!

[দুই]

দুটো দিন মাত্র মাঝখানে বয়ে গেছে।

আশ্রমে যে ভজন কুটীরে আগে থাকতাম, এখন থাকি না সে ঘরে। মালা অবশ্য বলেছিল, আপনার পূর্বের বসবাসের ঘরটিতেই থাকুন না!

ভরসা পাইনি আমি। যখন আশ্রমে থাকতাম, বহু পবিত্র আচার আচরণের মধ্য দিয়েই তো প্রতিটি দিন অতিবাহিত করতে হতো। বেশ ভাল লাগতো কিন্তু—ঐ ফেলে আসা জীবন ধারণের প্রণালীগুলি।....তবে হ্যাঁ, তখন কিন্তু আজকের মত এতো মূল্যবান মনে হতো না।—

কেনই বা আশ্রম ছেড়ে চলে গেলাম, আবার কেনই বা আশ্রম আমায় টেনে আনলে,—এই কথাগুলোই বসে বসে ভাবতে ভাবতে একেবারে কোন সুদূরে যে চলে গিয়েছিলাম; তা হয়তো

বুঝবার অবকাশ হতো না—যদি না মালা হঠাৎ করে এসে আমার ঘরে ঢুকতো।

ঃ আপনার মন কী ভাবছে, তা বলতে পারি কিন্তু!

এ কথা মালার মুখে নতুন নয়।

আচার্য্য জীবনানন্দ মহারাজের সামনেও অমন ভাবে মালা বলতো; শিহরণ জাগিয়ে দিত আমার মন-কমলে।

আচার্য্যদেব আমাদের এই ভাবের আনন্দ কথায় কখন-সখন যোগ দিতেন, বলতেন: তোর ভয়ে ব্রহ্মচারী এবার পালিয়ে যাবে।

মালা কিন্তু একটু তেজের স্বরেই উত্তর দিত: তাহলে পিতা —তোমার ব্রহ্মচারীকে—তুমি কাপুরুষ তৈরী করছো—

আজ এই মুহূর্তে মালার কথায় পূর্ব-স্মৃতিতে ফিরে যেতে যেতে উত্তর পেয়ে গেলাম। বললাম: কাপুরুষদের কিন্তু ভয় দেখাতে নেই।

মালা আর দাঁড়ালো না। মনোমালা।

মালার ভয়ে, না—আমার মনের অনুশাসনের ভয়ে,—তা জানি না। গত রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম: আশ্রমে যখন এসেছি—আর থাকতেও হচ্ছে আশ্রম গণ্ডীর মধ্যে,—তখন আশ্রমীর মতই যদি দিনগুলোকে পালন করে চলি—ক্ষতি কী?

ভোরেই উঠেছিলাম।

পদ্মাসনে বসে আত্মচিন্তায় ছিলামও কিছুক্ষণ। কিন্তু....'আভাস' চলে আছে বলে—মনকে নাগালের মধ্যে ইশারায়েও আনতে পারছিলাম না। বিরক্ত বোধ হচ্ছিলো বড্ড।

আশ্রম সরোবরে অবগাহনের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলাম। গলা

জলে নেমে পূব দিকে চাইতে গিয়ে দেখি—সূর্য্যদেব ঘোর রক্তবর্ণ পরিচ্ছদটি ত্যাগ করতে আরম্ভ করেছেন।........মনে পড়ে যায় আচার্য্যদেবের কথাঃ ব্রহ্মচারী! নিত্য সূর্য্যদেবের রক্তিমবর্ণটি চোখ মেলে দেখবে। আর ঐ মুহূর্তে চোখের পাতা দুটি বন্ধ করে মনের উৎপত্তি কেন্দ্রে—ঐ বর্ণটিকে বসিয়ে—ধরে রাখবার চেষ্টা করবে। ....বেশ কয়েকদিন চেষ্টা করেও—বিশেষ ভাবে জয়ী হতে না পেরে—একদিন আচার্য্যদেবের কৃপা ভিক্ষা করে বসি।

উত্তর দিয়েছিলেন তিনিঃ নিত্য অভ্যাসের মধ্য দিয়েই 'স্থিতি' আসবে।

মালার বড় কোমল-নরম মন। মালা তো চলে গেল।....মনের নূপুরে কী বোল্ বাজছে তার?

মনে হলো আমার—মালাকে ব্যথা দিয়েছি।....কী করি?

আমি যে 'হেরে' যেতে বসেছিলাম।

মালার খোঁজে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।....আবার, এ—কী আশ্চর্য্য উৎপাত! লজ্জা এসে আমায় বাধা দেয় কেন?

* * *

এই—একটু আগের যৌবন-ছোঁয়া মনটি তো মালাতে যেন নেই!

দেখতে পাচ্ছিলাম মালার পেছন দিকটা। পাছে—মালা—আমার নিকট হওয়ার 'শব্দ' পায়,—সাবধানেই চলছিলাম।

মালা হঠাৎ মুখ ঘোরালে। দেখা হলো। চোখে চোখে এক হলাম আমরা দুজনে।....কাতর চাহনিতে আমায় কাঁপিয়ে দিলে। ....আমি যেন অনেক লজ্জা-নরম হয়ে উঠলাম।

* * *

মালার নিত্য-পূজা শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ।

আশ্রম মন্দিরের বারান্দায় আমি একা। বসে আছি।

মালাও ছিল। মালা গাঁথছিল একটা।....মালা হাতে উঠে যায়।

....বহুক্ষণ তো হলো। এখনও আসে না কেন?

আমি চঞ্চল হয়ে উঠছিলাম। থেকে থেকে।....কিন্তু, করি কী? (ইচ্ছে তো ছিল না।) কথার পাপড়ি ছুঁড়ে ব্যথা দিতেও চাইনি। ....মালাকে, মনোমালাকে—হয়তো 'কাছে' পেতে চেয়েছিলাম।

এক—নিদারুণ মনোচ্ছবিকের পথে—হেঁটে চলেছি তখন।.... মালা এলো। আমার নিকট হলো।...আবার আমরা চোখে চোখে এক হলাম।....মালা যেন কী বলতে চাইলে।....পারলে না। মালার চোখে কাঁপন ছিল না কিন্তু!

কথা—আমিই বললাম। আগে।

: অন্য দিন তো এ সময় তোমায় পাই না!

—আজ পাবেন। সারাক্ষণ—আপনার 'বাতাসে'....আমি বসে থাকবো।

কথা—বলে, মালা যেন হাসলো একটু।

গতকাল হতেই মালার—ভাষার পরিবর্তন—আমি লক্ষ্য করে চলেছি। আজও করলাম। এই তো—এখনই মালা 'বললে।'.... মালা চায় কী? আমি কী—'দাগ'—ফেলে চলেছি মালার মনে?

* * *

সময় মধ্যাহ্ন।

এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম আশ্রম ভাঁড়ারে আর কিছু নেই। অথচ আশ্চর্য্য....আচার্য্যদেবের এই আশ্রমে বহুদিনই তো ছিলাম আমি। ....এমনটি তো হয়নি কোনদিন?

কথা বললে মালা: ঠাকুরকে এখনও কিছু 'দিতে' পারলাম না, এতে দুঃখ বোধ আসছে না। কিন্তু....

: কিন্তু কী ?

মালা বললে : আপনাকে যে উপবাসী রাখতে চলেছি....

মালার উচ্চারণে সুগন্ধ ছিল। ভরে গেলাম।....এখন আমার কর্তব্য ?....সমাধানের উপায় খুঁজতে যাবো—;....মালাই 'পরিষ্কার' করে দিলে : সময়ের সদ্‌-ব্যবহার করি,— চলুন।

বুঝলাম না মালার কথা। মনোমালা। কী বলতে চাইলে! মালা উঠে গেল।....আমি—আমার চোখ দুটোকে মালার পিছন পিছন পাঠালাম না। আমায় যেন 'কে' বাঁধতে চলেছে।....আমি—আপনার মাঝে যাতায়াত করতে লাগলাম।

ব্রহ্মচারী যে—!

জানা-মানুষের কথা যেন ? মুখ তুলতে হলো।....সামনে বনমালী দাঁড়িয়ে।

এ—সেই বনমালী ;—যার কথা আমার ভবিষ্যৎ জীবন—আমার নশ্বর দেহটির শেষ ক্ষণটুকু পর্য্যন্ত ভুলতেই দেবে না। ভুলতে দিতে যে পারে না। এমনই সম্পর্ক আমার সাথে—বনমালীর।

আচার্য্য জীবনানন্দদেবের পাশের গ্রামের মানুষ—এই বনমালী। এই আশ্রমে পড়ে থাকতো দিনরাত। আচার্য্যদেব ওকে নাকি কিছু তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা দিয়েছিলেন। কেন জানি—বনমালী আমায় বলতো সব কথা। আমি শুনে যেতাম আর ঢেউ লাগতো আমার মনোবীণার প্রতিটি তারে।....ওর মন-কুটীরে ছাউনি দিয়েছিল পাতা। পাতা ওর যৌবন-সরসীর জলে এসে ডুব দিয়েছিল।

আমি আশ্রমে থাকতেই, বনমালী আশ্রম ছেড়েছিল। পাতাকে নিয়ে আচার্য্যদেবের দীক্ষায় নির্জনে সাধনায় ডুব দিয়েছিল।

: বোনকে দেখছিনে !

বনমালীর কথায় নেমে এলাম মন-সিঁড়ি বেয়ে, বাস্তবে। বহু আহার্য্য উপকরণ বনমালী সাথে করে এনেছে। তবে....সব 'কাঁচা'। আগুনের তাপে খাদ্যে পরিণত হবে ও-গুলো।

কিন্তু, দাঁড়ালো না বনমালী। হঠাৎই চলে যেতে উদ্যত হলো! আমার মন পারলে না বনমালীকে থামিয়ে রাখতে। আমি যেন অনেক দুর্বল হয়ে পেছিয়ে গেলাম।

বনমালীর কথাই তখনও ভেবে চলেছি, মালা এলো। সামনে। ....হাতে তার ঐ আগের দিনের পুঁথি।

মালাকে দেখলাম আর আমার ভেতরে দুষ্টামি 'ভর' করলো।

প্রশ্ন করলে মালা : এ গুলো দিয়ে গেল কে ?

আমি নীরব রইলাম।

—বলুন না ?

কথা বললাম না।

: এখন কিন্তু আর আপনার কথা মনে আসছে না। আমি চলি। ঠাকুর আমার এখনও কিছুই খান নি। আমি খেতে দিতে পারিনি।....হাতের পুঁথি আমার কোলে নামিয়ে দিলে।....একটু নত হয়ে দু-হাত দিয়ে কুলো-টি তুলে নিলে। চলে গেল।

বড় একটা কুলোয়—চাল, ডাল, নুন, লঙ্কা, সবজি—এই সব সাজিয়ে এনেছিল বনমালী। মাঝারী ছোট্ট একটি কাঁসার বাটি চালের বুকে একটু টিপে বসানো ছিল। বাটিটাতে ছিল গব্য ঘৃত। গাওয়া ঘি।

—এখানে একটি নারী-মনকে বুঝতে পারলাম না যেন।....একটু আগেই আমার জন্য ভাবনা ছিল।....সে ভাবনা যে আবার ফিরে গেল ঠাকুরের দিকে।....যা হোক—এটা তো বুঝলাম—নারী-প্রকৃতি সেবার মৌন-মুকুট প'রে বসে থাকে। খাদ্য উপকরণগুলো ও-কে ভুলিয়ে দিয়েছে। জানতেই চাইলে না....

দেখলাম। মালাকে।

দেখতে পেলাম মালা নত হয়েছিল বলে। সে-ক্ষণে যে মালার বুকের বৃন্ত....

থাক। নিজেকে শাসন করলাম।

মালা এলো। বললে : ডাল চড়িয়ে এসেছি। সময় নেবে। ততক্ষণে পুঁথিতে মন দেওয়া যাক একটু—।

: কোন্ ভক্ত-কাহিনী পড়বে ?

—পুঁথি তো আপনার হাতে। হঠাৎ করে খুলে ফেলুন। সেই পৃষ্ঠাতেই আমরা 'চলতে' থাকবো—।

এমন ছলাৎ করে আমার বুকে ঢেউ তুলছে মালা, কেন ? হয়তো বা ওর বুকের তড়িৎ আমার চোখে স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে বলে....। তাই কী (?)

মালাকে 'করাতে' পারলাম না। পুঁথির পাতা ওলটাতে হলো আমাকেই....পৃষ্ঠায় এলেন অর্জুন মিশ্র। জানতে চাইল মালা : কে এলেন ? আমি বলে দিলাম। পুঁথিও দিলাম মালার হাতে।

মালার অধরা-অধর হতে পুঁথির লেখা উচ্চারিত হয়ে চললো—

শ্রী পুরুষোত্তমধাম পুরীতে থাকতেন ভাগবত সাধু অর্জুন মিশ্র। সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে—।

"পণ্ডিত গম্ভীর মহা উদার চরিত্র।
নির্মৎসর শান্ত শিষ্ট তদগত চিত ॥
ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্বত্র উদাস।
শ্রীমদগীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস ॥"

—শ্রী গীতার ব্যাখ্যা লিখে চলেছেন। নবম অধ্যায়ের বাইশ শ্লোকে এসে থামতে হলো। ভগবান বলছেন : যোগক্ষেমং বহাম্যহম।....তেষাং নিত্য অভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমম অহং বহামি। ....কী রকম ? কাদের ?

—অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পরি-উপাসতে,—তাদের। এক মনে শ্রী ভগবানকে যে মানুষ স্মরণ করে চলে—শ্রী ভগবানই স্বয়ং সেই মানুষের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেন ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করে থাকেন।

"এক মনে করে যারা আমার চিন্তন
অথবা শ্রদ্ধায় করে আমার পূজন
আমার উপরে যারা সদা নিষ্ঠাবান
যোগমোক্ষ তাহাদের আমি করি দান।"

—সন্দেহ হলো ভাগবত সাধু অর্জুন মিশ্রের।....এমন তো হয় না!

"আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয়।
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয়॥"

—কেটে দিলেন।—"বহাম্যহম"—শব্দটিকে। ভগবান স্বয়ং ভার গ্রহণ করেন না।....ভক্তকে সব দিক থেকে রক্ষা করেন, তা সত্য। তবে·

—অন্যের দ্বারা। তাইতো দেখা যায়। অন্য মানুষই তো আসে। ভক্তকে সাহায্য করে। ভক্ত-মানুষ অন্যের নিকট হতে সাহায্য পান। তাই, অভাব বোধ তাঁর থাকে না। তিনি নাম-নিষ্ঠ হয়ে দিনাতিপাত করতে পারেন।—

"গীতাপাঠ কাটাতে অক্ষরে আঁচড়িতে।
রামকৃষ্ণ অঙ্গ ক্ষত হয় সেই ঘাতে॥"

শ্রীভগবান—ভক্ত অর্জুন মিশ্রের ভুল ভাঙ্গতে চাইলেন—

"জানাইতে তাহারে করিলা কিছু ভঙ্গি।
আচম্বিতে ব ড় বৃষ্টি হয়ে উত্তরঙ্গী॥
ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে।
পরদিনে গেলা পুন ভিক্ষা অভিলাষে॥"

এদিকে ভগবান জগন্নাথ দেখ খেলা খেললেন খানিক—

"হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম।
ব্রাহ্মণ বালক রূপে আইসে মিশ্রধাম।
দু'জনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার।
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার ॥

—এখানটায়—কেঁপে উঠলে মালা। হস্তস্থিত পুঁথি বন্ধ করে দিলে। কথা বললে না একটিও। পুঁথি রেখে দিলে—বসার সামনে। উঠে গেল।

আমি যে সংযমে কতোখানি দুর্বল, তা বুঝতে চললাম। আমার —'অধিকার' সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই জন্মায়নি, এটিও অতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

মালা—আমার সামনে ছোট্ট ছিল। বড় হয়ে উঠছিল, আমার সামনেই। তখন তো আমি আচার্য্যদেবের আশ্রমে, আশ্রমবাসী।

একদিন আচার্য্যদেবকে বললাম: অনুমতি দিন, আমি বাড়ী যেতে চাই।

ঃ অতি আনন্দের কথ—

এই উত্তর পেয়েছিলাম।...বাড়ীতে আমার তো কোনো বন্ধনই ছিল না। ভেবেছিলাম: নাম-নিষ্ঠ হতে সেখানে বাধা থাকবে কেন।

পূর্ণ একটি বছর মহানন্দে কেটে গেল। ইচ্ছা জাগলো, আচার্য্য-দেবের সাথে একবার দেখা করে আসি। তাইতো আমার এবারে আসা।....না, এর মধ্যে আরও কিছু 'কিন্তু' আছে তো!

এসেই, মালাকেই প্রথম দেখি আশ্রম প্রাঙ্গনে। সেদিন....মালা তখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে এসেছে।....বলতে দ্বিধা নেই, অতি আপনার মনে হয়েছিল মালাকে। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। মালা যে 'জীবন্ত'—এ অনুভবে প্রবেশ করেছিলাম। তখনই 'সজাগ' হই —আমার 'অধিকার' সম্বন্ধে।

ঃ ভক্ত-কাহিনী আধখানা পড়ে রাখতে নেই। তাই এলাম।

আমি মালার দিকে চাইলাম একবার। করুণ-কাতর-সজল-ছায়া মালার চোখে। মুখ নামিয়ে নিলাম।

মালা—পুঁথির পাতায় আমায় টানলে—

"লইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা।
ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥
এতেক প্রসাদ তেঁহ পাইলেন কোথা।
তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে লইল ব্যথা॥"

—যাক্, তোমাদের অঙ্গে রক্ত-ধারা দেখি কেন? কোন্ সে দয়াহীন কঠোর মানুষ! এমন ভাবে প্রহারই বা করলে সে, কী কারণে?

"তাঁহারা কহেন মিশ্র ঠাকুর মারিল।"

—না, না। এ-কী বলছো তোমরা? শ্রীমিশ্র ঠাকুর তো অমন মানুষ নন। তোমরা তাঁকে চেনো না নিশ্চয়ই! ভুল হচ্ছে তোমাদের। আর, তিনি—তোমাদের প্রহারই বা কেন করবেন?—

"শ্রী মিশ্র ঠাকুর কারু নাহি দেন পীড়া।
ব্রাহ্মণ বালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া॥
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর।
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু-চোর॥
সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আহা মরি।
কেমন নির্দয় সেই দয়া নৈল হেরি॥"

ছদ্মবেশী ভগবান জগন্নাথ দেব—মিশ্র গিন্নীর কথাগুলো সব শুনলেন। মনে মনে নিজের লীলায় নিজেই মত্ত হয়ে উঠলেন।.... ভক্তের ভুল ভাঙতে হবে। ভক্ত অর্জুন মিশ্রের কথাই যে একদিন শত-শত মানুষের বুকে প্রেরণা হয়ে দেখা দেবে—

তাই বললেন:

"পুন শিশু কহে মাতা সত্য যে কহিনু।
মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥"

মিশ্র গিন্নার জননী হৃদয়ে ব্যথা বাজলো—

"কেন বা মারিল হেন কুমতি হইল।
এ হেন সোনার অঙ্গে আঘাত করিল।।"

উত্তরে শুনলেন : "—মোরা কিছু নাহি কহিঁ।।"—আমরা শুধু মিশ্র ঠাকুরের সামনে ছিলাম। এইটুকুই আমাদের অপরাধ।—

"লোহার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহার আঘাতে।
আঁচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে।।"

মিশ্র গিন্নী শুনলেন বালক দুটির কথা। তাঁর কণ্ঠ আর একটি অক্ষরও উচ্চারণ করতে পারলে না।

"এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া।
পড়িয়া রইল ভূমে আক্রোশ করিয়া।।"

—বালক দুটি আর সেখানে দাঁড়ালো না।....ওদিকে, মিশ্র ঠাকুরকেও ভিক্ষা শূন্য হাতে ফিরে আসতে হলো—"ভিক্ষা নাহি মিলে বাত বরিষণ তরে।"

স্বামীর দেখা পেলেন। দেখা পেয়ে—

"এ হেন কুমতি তব কি লাগিয়া হইলা।
আহা মরি দুটি শিশু মারিয়া ডারিলা।।"

একে ভিক্ষা শূন্য হয়ে ফিরেছেন—তায় স্ত্রীর মুখে ঐ কথা! বড় বাজলো তাঁর প্রাণে—

"কোথা হতে আইলা শিশু বিবরণ কহ।"

—স্বামী নিজের দোষ লুকিয়ে যেতে চাইছেন। মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন মিশ্র গিন্নী—

"জানো নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার?"

আশ্চর্য্য কথা! অবাক মানলেন—

"—আমি তো না প্রসাদ পাঠাই।
পাঠাইল প্রসাদ কেবা সে বালক বা কই।।"

মিশ্র-গিন্নী আরো বেশী করে প্রবেশ করলেন চিন্তা কুয়াশায়। এখন কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। সংক্ষেপে শুধু বললেন : শোনো তবে—

"তবে ঠাকুরাণী পুন চমকিয়া কহে।
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে।।
অপূর্ব স্বরূপ দুটি গৌরী-কৃষ্ণ বর্ণ।
অতি সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ।।
স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্ত-ধারা।
কান্দিতে কান্দিতে আইল যেন পুতুলা হারা।।
কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা।
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা।।"

ভক্ত সাধু অর্জুন মিশ্রের আর বুঝতে বাকী রইল না—

"পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা।
গীতা পাঠ কাটা হেতু অনুভব কৈলা।।"

—ঐ যে 'বহাম্যহম'—কেটে দিয়েছি,—ঐ ভুল ভাঙ্গতেই ভগবান আমায় এ ভাবে কৃপা করলেন।

"বুঝিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা।
কহে তবে সত্য আমি অঙ্গ আঁচড়িলা।।"

আমার ভাবান্তর হলো—।

বহুদিন-অতীতের সাথী বনমালীকে দেখে—ভুলেই গিয়েছিলাম কুশলাদি কিছু প্রশ্ন করতে।

আমার—আশ্রমে থাকতেই তো বনমালী পাতা-কে নিয়ে তার সাধনার জন্যে আশ্রম ত্যাগ করেছিল। আর—তারপরে একটি দিনও বনমালীকে দেখেনি।....সে কর্তব্যচ্যুত হচ্ছে দিনকে-দিন, তাই ভেবে আচার্য্যদেবকে বলেছিলাম আমি : মাঝে-মধ্যে একদিনও তো বনমালীর আসা উচিত।

—না, বনমালী এখন আসবে না। তাকে আমার বলা আছে। বুঝিয়ে দেওয়া আছে।

এবারে—আশ্রমে এসেও তো বনমালীর কথা মনে ছিল না। বনমালীকে দেখেও তো কোনো প্রশ্নই জাগে নি।—কোনোই···· সমাধানে আসতে পারছি না। এমন সময়—

ঃ আপনি আনমনা হয়ে পড়ছেন।

—তাইতো! চোখের চাহনিতে ক্ষমা চেয়ে নিলাম, মালার কাছে।

মালা বললে, আশ্রম ছেড়ে এ কয়দিনে অনেক বিদ্যে শিখে ফেলেছেন দেখছি! আমার পড়াতে মন দিন।

মালার কথায় প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আরো একটি ভয়ও উঠে এসেছিল আমার সামনে।—খাদ্য-উপকরণগুলো কে দিয়ে গেল—আবার না মালা জানতে চায়!

মিশ্র গিন্নীও ততোধিক ভাবাকুল হয়ে অধীরভাবে প্রশ্ন করে বসলেন ঃ

"—কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোরে।"

অস্ফুট স্বরে কোন রকমে আপনাকে প্রকাশ করলেন মিশ্র ঠাকুর—

" 'বহ্বাম্যহম' পাঠে মূঢ়ে অবজ্ঞা করিল।
তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বহি দেখাইল।।
জগন্নাথ বলরাম আইলা গৃহেতে।
তুমি ধন্য দেখিলা নহে মোর ভাগ্যেতে।।"

আমি কিন্তু তখনও অন্যমনস্কই ছিলাম। মুখটি ফেরানো ছিল অন্যদিকে। শুধুমাত্র মালার মুখের সুরে সজাগ ছিলাম খানিকটা। কাণে—মালার কথা না আসাতে, ঐ ভাবেই জানতে চাইলাম ঃ চুপ করলে যে?

মালার কোনো কথাই শুনতে পেলাম না। ফিরতে হলো····এ-

কী ? মালা কাঁদে কেন ? কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিন্দু পুঁথির ওপরও পড়ে রয়েছে !....নিশ্চয়ই ভগবানের করুণায় নত হয়েছে মালা।

বেশ কিছু সময় অতীত হলো।

কিন্তু, মালার মধ্যে কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম : মালাকে এখন 'ফেরানো' উচিত।

বললাম : বনমালী এসেছিল—।

বনমা—?—সবটা বলা হলো না মালার। মাটিতে লুটিয়ে পড়লে :

ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়ে গেছে।

প্রসাদ-অন্ন ভোগ মন্দির হতে বাইরে আনলাম।....কী হয়েছে মালার ? বনমালী—কী, কোনো গভীর অপরাধ করে বসে আছে, আশ্রমের কাছে ?

....কী ভাবে মালাকে 'সহজ' করি এখন ?

মালা—নিজে নীরব। সেই—বহু আগে, শুধু 'বনমা'—কথাটি শুনেছিলাম মালার মুখে।

সহজ করতে চাইলাম—পরিবেশটিকে,—বনমালী কী....

—মালা বললে : বনমালী গত হয়েছে বহুদিন।

আমি তখন আর আমাতে 'থাকতে' পারলাম না।....প্রথমে লুটিয়ে পড়লাম আশ্রম বিগ্রহের সামনে।—

মালা বসেই ছিল। মালার নিকট হলাম।....সঙ্কোচ কাটিয়ে মালার হাত দুটো ধরে টেনে তুললাম। উঠে দাঁড়ালো মালা।

ভয়ানক হাল্কা বোধ হয়েছিল মালাকে।....যে অনুভবের জগতে প্রবেশ করেছিল মালা,—ওতে কী দেহটিকেও হাল্কা করে দেয় ?

[তিন]

মাত্র একটি দিন পরে।—

কত বিধি স্রজীঁ নাহি জগ মাহীঁ।
পরাধীন সপনেহুঁ সুখু নহীঁ

—বিধাতা জগতে কেন সৃষ্টি করেছেন নারীকে? এই পরাধীন জাতির স্বপ্নেও সুখ নেই।....শ্রীরামচরিতমানসের এ-ই কথা—বনমালী শিখিয়েছিল আমাকে। বনমালীর—পাতা-কে, আমি দেখেছিলাম একবার। একবার মাত্র দেখলেও—সে স্নিগ্ধ-লাবণ্য ঝরা শ্যামল রূপখানি আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।

বসে বসে নিরালায় পাতার কথাই ভাবছিলাম। আহা! বেচারী এখন—একলা পড়ে গেছে! কেমন করেই বা যে তার দিনগুলো কাটছে!

সন্ধ্যা সবেমাত্র তার আঁচল বিছিয়ে দিনের আলোময় জগতটিকে অন্ধকারে নিয়ে যেতে চলেছে। বাইরের অন্ধকারের সাথে সাথে আমি কিন্তু আঁধারে প্রবেশ করতে পারিনি। বরং বাইরের আঁধার আমায় আরও নিরালায় যেতে সাহায্য করছিল। হৃদয়ের নিরালা-হ্রদের পাড়ে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি তখন। ডুববো ডুববো শুধু ভাবাই সার হচ্ছে।....পাতা ছপ্ ছপ্ করে চলে আসছিল।....আর—আমি বেদনার আভায় পাতাকে বরণ করে চলেছিলাম।

: বেশ মানুষ তো আপনি—!

একেবারে আমার ভীষণ সামনে মালা। ভাবতেই পারিনি—এ অবস্থায় এ বেশে মালাকে দেখতে পাবো এখানে। পূর্ব-কালের ঋষিকন্যার সাজে এসেছে।····কিন্তু—আমাকে এখন প্রয়োজন কী মালার (?)

: আজ না কথা ছিল আশ্রম বিগ্রহের আরতির সময় আপনি থাকবেন—।

আশ্রমের অশোক কুঞ্জে বসে ছিলাম আমি। আগেকার আমার আশ্রম জীবনে নিত্য সন্ধ্যা হওয়ার পূর্ব-ক্ষণে এখানে এসে বসতাম। উঠতাম—আশ্রম বিগ্রহের সন্ধ্যারতির শব্দ পেয়ে। তখন বিগ্রহের আরতি করতেন আচার্য্য জীবনানন্দ দেব। আমি থাকতাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মালা অবশ্য থাকতো মন্দির-গর্ভেই।

আর বিলম্ব নয়।—

আমি হেঁট মুখে অনুসরণ করে চললাম মালাকে। মালা—আমার আগে আগে জ্বালা-প্রদীপ হাতে হেঁটে চলছিল। দু-দুবার মালার কথা শুনেছি। আমি একটি কথাও বলিনি।

আবার—আমার 'অধিকার'— আমায় সজাগ করে দিলে।····বাড়ীতে এসে যে কয়মাস ছিলাম—নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম—যেন কোন নারী-আননের সন্দর্শন না ঘটে।....এই দূরে দূরে থাকার ফলেই—আমি সহজ করে নিতে পারছিলাম না আচার্য-কন্যা মালাকে ····মনে হচ্ছিল তখন আমার, 'ভয়ের'—মাঝে থেকেই ভয়কে জয় করতে হয়।····'ভয়'—হতে দূরে সরে থাকলে, 'ভয়' তো 'বর্তমান'-ই রইলো। ভয় তো দূর হলো না,····বনমালী বলতো বটে : তোমায় জন্ম দিল নারী; আর সেই নারীকেই শাস্ত্র নাকি বলেছে—দূরে রেখে চলবে।····আবার বুঝিয়েও দিত বনমালী : কাম গন্ধহীন হবার সাধনায়—নারীর সাহায্যই বড় সাহায্য।

বিগ্রহের সামনে পূজার আসনে মালা বসলে।

আমি রইলাম মন্দির-বারান্দায়। মালার পিছন দিকটাই দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

একটি কালো রেখা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পিঠে যেন আঁকা হয়ে আছে। এক বেণীতে কেশ-প্রসাধন করেছে যে। সম্পূর্ণ পিঠটাই প্রায় উন্মুক্ত। শুধু মাত্র লাল রেশমী কাপড়ের ছোট্ট এক ফালি টুকরো দিয়ে ওর উন্নত বক্ষকে যে শাসন করে রেখেছিল কিছুটা, তারই বাঁধন ছিল পিঠের মাঝখানটায়; তবে আড়ালে ছিল একটু —ঐ এক বেণীর অন্তরালে—।

দেখলাম কোশার বাঁ দিকে একটি অধোমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকলে। অনেকটা যোনি চিহ্নের মত মনে হলো। সে মুহূর্তে আমার মন চলে গেল মালার উরুদ্বয়ের সন্ধিস্থলে।....চলে এলো বনমালী ও তার একটি দিনের কথা: কোনো ভক্ত যদি সপুষ্প-সমাকীর্ণ কামমন্দির সম্মুখে ধ্যান করে—

: আপনি চঞ্চল হচ্ছেন কিন্তু!

অবাক মানলাম। মালা কী আমার মনোকথা....

ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মালা উঠে দাঁড়ালে। ডান হাতে পঞ্চ-প্রদীপ নিয়ে একটু নত হলো। বিগ্রহের শ্রীচরণদ্বয় লক্ষ্য করে বার কয়েক পঞ্চ-প্রদীপটি ঘুরিয়ে নিলে।....আমি কিন্তু গুণে চললাম: চারবার ঘুরিয়ে—বিগ্রহের নাভি-সমীপে হাত এনে দুবার; বিগ্রহের মুখ মণ্ডলে তিনবার ও সর্বাঙ্গে সাতবার আরত্রিক করলে।

—আমি তো মালার পিছনে....।

ওর গুরুভার নিতম্ব আমায় স্থির হতে দিচ্ছিলো না। আমার লক্ষ্য থেকে থেকে কেবল ঐ দিকেই ছুটে চলেছে—।....এখন নিজেকে 'রক্ষা' করি কী করে? উপায়ও—মনমুখে এসে গেল।....সরে গেলাম

অনেকটা। বিগ্রহের সামনা-সামনি আর রইলাম না।···ভয়ের মাঝে থেকে ভয়কে জয় করতে হয়,—এই যে খানিক আগে দর্শন-তত্ত্ব একটি আবিষ্কার করে বসেছিলাম—দৃঢ়তা আনতে পারলাম না ও-তে।

আরতি বুঝি শেষ হলো।····শঙ্খ ধ্বনি শুনলাম।···ঐ ধ্বনির পবিত্রতা আমায় 'ফিরিয়ে' আনলে। এলাম একেবারে মালার সামনেই। মালা তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। সারা মুখটিতে একটু যেন দুষ্টামি ভরা হাসি—

: পালিয়ে গেলে কী সংযম দৃঢ় হয়?

আমিও বলে ফেললাম : তাহলে আরতিতে মন ছিল না তোমার।

হাসলো মালা। অধরা হাসি। মিঠি মিঠি ভাব একটি চোখ দুটো হতে বেরিয়ে আসছিল তার।

আমার কথার উত্তর দিলে—অতি অল্প একটু পরে।—আরতিতে মন দেব কী করে? আপনিইতো বার বার 'নামিয়ে' দিচ্ছিলেন, চুমুক দিচ্ছিলেন আমার এই নারী দেহটিকে।····আবার পরক্ষণেই রক্ষাও করলে : আসুন। অমন হয়, বলেই—আমার হাত দুটো টেনে মন্দির-গর্ভে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিলে।

বিচিত্র তুমি মালা। তুমি অভিনব। মনোমালা-যে তোমার, তোমার নাম।····আচার্য্য জীবনানন্দ মহারাজের দেওয়া।

নিজের ঘরটায় এসে বসে আছি। একটি প্রদীপ জ্বলছে ঘরে। প্রদীপ-আলোয়—মালার কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে চলেছি।

মন্দিরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, একেবারে আমার গা লাগা হয়ে মালা এসে দাঁড়িয়েছিল।····ওর মসৃণ গাত্র-চর্মের স্পর্শ পেয়েছিলাম।

প্রায় বসন-শূন্যই তো ছিল মালা।····আমি যে মুহূর্তে খানিকটা 'বোধি-বিদ্যুতে' আছাড় খাই ও সাথে-সাথেই শুনতে পাই মালার কথা : আগে রূপ, তারপর অরূপে প্রবেশ। আপনাকে ছুঁলাম কেন জানেন?

উত্তর দেব কী ?—কথা বলার সামান্য ক্ষমতাও তখন আমার নেই।

আমায় নীরব দেখে, মালাই বললে : স্পর্শ-অনুভূতি জাগালাম আপনার মধ্যে। সৃষ্টির সবটাইতো স্পর্শের ব্যাপার।

মালার শেষ কথাটিতেই মন লেগেছিল।....কী বলতে চেয়েছিল মালা ? কোন্ তত্ত্ব ফোটাতে চেয়েছিল ?

নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে যাবো—

: আপনার জন্যেই আসতে হলো—

—আমার জন্যে ?

: হ্যাঁ, তাইতো। আপনাকে 'ডাঙ্গায়' তুলতে এলাম।

হাসলাম আমি। আমার হাসি লক্ষ্য করে মালা বললে : হাসছেন ?

থামলো একটু। এবারে বললে : ভেতরে ভেতরে আপনি কিন্তু টল-টলায়মান—

সুযোগ হলো একটি। বললাম : তুমি কী স্পর্শ-চেতনার কথা বলতে চেয়েছিলে ?

: যাক্, বাঁচলাম আমি। আচার্য্যদেব আবার না এসে বলেন, আমার ব্রহ্মচারীকে তুমি নষ্ট করে দিয়েছো কন্যা—।

ভয়ানক হাসি পেল আমার। মালাও হেসে উঠলো। বললে : আপনার হবে। অধ্যাত্ম-তত্ত্বে প্রবেশের পথে—প্রায় সাধকই ভেবে বসেন---পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 'চক্ষুই' তো প্রথম। সত্যি কথা অবশ্য ! কিন্তু—'চোখ' পেলাম কোথায় আমরা ? এই—চোখের উৎপত্তিতে গেলে, মেলে—গর্ভ-ধারিণীর পরিণত ডিম্বকোষের আবরণ ভেদ করে পিতার 'বীজ' যেই প্রবেশ করলো তা তো স্পর্শের মধ্য দিয়েই হলো ; ও, সেই ক্ষণটি হতেই তো সূক্ষ্মতম প্রাণ স্পন্দন আরম্ভ হয়ে গেল। এ-ই 'ভাব'-ই তো আপনার ও সবারই জন্মের মূল।

হঠাৎই বলে বসলাম : তুমি এতো জানলে কী করে ?

: বাঃ রে ? আমি না আচার্য্য-কন্যা ? অধ্যাত্ম-তত্ত্বে প্রবেশের অধিকার কী শুধু ব্রহ্মচারীদেরই ?

আরও পরিষ্কারভাবে তত্ত্বটি আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। হলো না।

আমার হাত ধরে আসনে বসিয়ে দিলে। বললে : আর একবার স্পর্শ-অনুভূতি জাগালাম আপনার মধ্যে !

এতক্ষণে লক্ষ্যে এলো, মালার হাতে পুঁথি।

মালা একটি কুশাসন টেনে নিয়ে সুখাসনে বসলে। ঋষি-কন্যার সাজেই—তখনও সে সজ্জিতা। পুঁথির পাতা উলটিয়ে যেতে যেতে একস্থানে এসে থামলো।

: আপনার জন্যেই বিশেষভাবে নির্বাচিত। এখন এই ভক্ত কাহিনীতে একটু সরে আসুন—

"দক্ষিণ দেশেতে কৃষ্ণবেণা নামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্মবাদী ।।
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
লম্পট স্বভাব ধর্ম-অংশে অতি ক্ষিপ্র ।।"

: শুনছেন তো ?

আহত হলাম। তখনও কিন্তু মালার স্পর্শ-শিহরণ—আমায় একটু উন্মনা করেই রেখেছে। আমি যদিও মালার দিকে তাকিয়ে নেই, মালার অঙ্গখানি....

: পালিয়ে ছিলেন তো সংযমে দৃঢ় হতে, তাই না ?

—আবার সেই এক-কথা শুনতে হলো। শুনলামও।........ এবারেও 'রক্ষা' করলে মালা : মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। বেশ—করেছেন আপনি ....এখন তো বুঝছেন ?....

'মন ভাঙ্গা' হবেন না। ভক্ত কাহিনীতে চলে আসুন—

"নদী পারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী ॥
একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ-মৃতা তিথি।
বেশ্যা কহে নদী পার না আসিহ ইথি ॥"

কিন্তু....এ যে অসম্ভব তাঁর পক্ষে। সম্পূর্ণ অসম্ভব।....ভাবনায় পড়লেন বিপ্র বিল্বমঙ্গল—

"সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্ন মানস।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ ॥
বৃষ্টি-বরিষণ ঘোর রহে ঝঞ্ঝাবাত।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত ॥"

নদীতীরে এলেন। পার-ঘাটে একটিও নৌকা নেই। এই দুর্যোগের রাতে—মাঝিরা সব নির্বিঘ্ন-আশ্রয় নিয়েছে।....এখানে এসে —দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না—

"কাম-তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা।"

—চিন্তামণির দেহ-লতা যে খোঁচা, দিয়ে চলেছে, বিপ্র বিল্বমঙ্গল-কে—

"কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইলা আগে ॥"

ঐ গলিত শব-দেহটিকে ধরেই নদী পার হলেন—

"সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্বাঙ্গ ভরিয়া।"

বিপ্র বিল্বমঙ্গল—চিন্তামণিতে লয় হয়ে গেছেন যে। কী হচ্ছে, কী হচ্ছে না—সে জ্ঞানটুকুও কী আর আছে—

"সে অনুধাবন নাহি কষ্টে পার হইয়া ॥
বেশ্যার বাড়ীর চৌদিকে ফিরে ধাইয়া ॥

প্রাচীরের গর্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া ॥"

আর ভাবনা কী? এই তো এক অবলম্বন পেয়ে গেলেন—

"দ্বার না পাইয়া দীর্ঘরজ্জু বুদ্ধি করি।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি ॥
ভিতরে উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাজন ডরে হড়বড়ে ॥"

—প্রদীপ হাতে কয়েকটি বেশ্যা একত্র হয়ে বাইরে এলেন। চিন্তামণির ঘরে যে বিপ্র আসতেন, সেই বিল্বমঙ্গলই তো; ...বিপ্র বিল্বমঙ্গলের আর উঠবার ক্ষমতা নেই। লাফিয়ে উঠোনে পড়েছেন বলে, দেহের স্থানে আঘাত পেয়েছেন বেশ। বিপ্রের নিকটে যাবারও যে উপায় নেই—

"অঙ্গেতে দুর্গন্ধ ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে—"

—বলে দিলেন বিপ্র—কী করে চিন্তামণির দোরে আসতে পারলেন—

"স্নান আদি করাইয়া বসাইয়া গৃহে।
বিশেষ ভৎর্সনা করি বেশ্যা বহু কহে ॥"

—চিন্তামণি বললেন: তোমায় আর বলি কি! তুমি আমার বলবার 'পারে' চলে গেছ। তবে—আমার মনের দিক হতে—আমি একটু গর্বিতা। আমি যে তোমার ভালবাসা পেয়েছি। তুমি বেশ্যা জ্ঞানে—আমায় হীন মনে করোনি। তোমার মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছ আমাতে। তোমার কাছে ঋণী আমি।....তবে, একটি কথা বিপ্র: আমার প্রতি তোমার এই অনুরাগের শতাংশের এক অংশও যদি কৃষ্ণ-চরণে নিবেদন করতে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সেবার অধিকারী হতে তুমি। আমি নারী;

তায় বেশ্যা। তথাপি—তোমায় বলতে বাধ্য হলাম আমি। আমার প্রভি—তোমার ভালবাসাই—আমায় দিয়ে বলালে—।

চিন্তামণির কথায়, বিপ্র বিল্বমঙ্গলের অন্তর-কুঞ্জে ফুল ফুটলো—

"রাত্রি কৃষ্ণলীলা গানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল ॥"

—চিন্তামণির মধ্য দিয়ে শ্রীভগবান 'পথ' করে দিলেন।.... পথে যেতে যেতে দেখা হলো সাধু সোমগিরি মহারাজের সাথে। মহারাজ 'আশ্রয়' দিলেন—কৃষ্ণমন্ত্রে। শ্রীগুরু সেবাতে পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত হলো।... শুদ্ধ প্রেমধনের অধিকারী হলেন—বিপ্র বিল্বমঙ্গল।

"কৃষ্ণ দরশনে মন উৎকণ্ঠা হইল।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল ॥
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়।
দিগ্বিদিক নাহি অনুরাগে ধায় ॥"

—এইভাবে বহু পথ অতিক্রম করে—শেষে একদিন এলেন একটি গ্রামের প্রান্তে।....সরোবর আর সরোবর তীরে ঐ যে ছায়া ঘন বৃক্ষতল দেখা যায়, ও যেন ডাক দিচ্ছে বুঝি—

"প্রেমাবেশে অন্তর্মনা দুই চার দিন।
বসিয়া রহিয়া তথা আত্মস্ফূর্ত্তিহীন ॥
গ্রামস্থ প্রবীণ লোক দেখিয়া সুপাত্র।
ভক্তিভাবে প্রশংসয় ছলছল নেত্র ॥"

—ঐ সরোবরে নিত্য গ্রামস্থ বহু নরনারী স্নান করতে আসেন; বিপ্রকে দেখেন। কেউ দূর হতে, কেউ বা নিকটে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। চলে যান।....যৌবনের উল্লাসে গর্বিতা এক ভর-তনু সুন্দরী যুবতী স্নান করছিলেন। সে—ঐ গ্রামেরই এক বণিক-স্ত্রী।

"দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হইল।
হেন যে সাধুর মন ঈষৎ টলিল ॥
আপন অন্তর-রীত বুঝিয়া আপনে।
উপায় সৃজিলা কিছু শান্তির কারণে ॥"

—এতো যে কৃষ্ণ-নাম !....ভুলে গেলেন সব—

"স্নান করি সেই নারী যে দিকে চলিলা।
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা।"

বিপ্র বিল্বমঙ্গল আমাকেটাও 'ন' দিলেন যেন। আমি লোভাতুর হয়ে উঠলাম। চেয়ে বসলাম—মালা, মনোমালার দিকে !.... আমার 'লোভনীয় নিবেদন' স্পর্শ করতে চলেছে মনোমালাকে ....কে যেন শাসন জানালে....ফিরতে হলো। ফিরলাম।....ক্ষীণ কটির মাতাল-সৌরভে তখনও আমি মগ্ন !....বিবেক 'জাগাতে' চাইছে; আমি 'জয়ী' হতে পারছি না। অবশেষে, বিমনা হয়েই ছুঁয়ে চললাম পুঁথির কথা—

"বধু নিজ অন্তপুরে প্রবেশ করিলা।
সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা ॥
হেনকালে সেই স্ত্রীর স্বামী সুচরিত।
দ্বারে সাধু বসি দেখি হইলা চকিত ॥"

—বলুন প্রভু, আপনার প্রয়োজন-কথা। এ—দীন আপনার সেবা করে ধন্য হোক।—

"সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ ॥"

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলে না—সে বণিক।....বিপ্র বিল্বমঙ্গল তো সাধু বেশে বৈষ্ণব তখন। শুমধ্যাত্র মালা-কণ্ঠি আর তিলক চন্দনে তো

কেউ বৈষ্ণব হয় না। যার—সর্বভূতে বাসুদেব দর্শন হয়, বৈষ্ণব তো তিনিই—

"বৈষ্ণব পিরীতি কার্যে স্বীকার করয়।"

—অন্তঃপুরে স্ত্রীর কাছে চলে গেল। আপনার আনন্দ-মত স্ত্রীকে সাজালে—

"নির্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।"

—সুন্দরী যুবতীর অঙ্গ-গন্ধে....স্বচ্ছদৃষ্টির আলপনা কিছু আঁকলেন. বিপ্র বিল্বমঙ্গল।....এবারে—বসলেন, নিত্য-অনিত্য বিচারে—

"আরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ।।
রক্ত-মাংস-ক্লেদ-বিষ্ঠা মূত্রময় দেহ।
ত্বক-আচ্ছাদন মাত্র দরশ সুবহ।।
নির্ঘন তোমার মতি এ হেন কদর্য্য।
লালসা করহ যাতে নিন্দিত অভূজ্য।।"

—না, না, না।....এতে আনন্দ কই? নারী-সঙ্গ তো ক্ষণকালের একটু আরাম মাত্র। 'নেমে গেলেই' সব শেষ।

"এতেক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে।।"

—যাও সুন্দরী যাও। এক পল সময়ও আর অতীত হতে দিও না।

"আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজ চক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে কহিলা।।
পুনঃপুন আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে।
বণিক দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে।।"

বুঝতে পারলাম—মালা একটু আড়-নয়নে দেখে নিলে আমাকে।

আমিও মালাকে দেখতে লাগলাম।....বিপ্র বিল্বমঙ্গলের নিত্য-অনিত্য বিচার আমার কাছে 'পরাজয়' স্বীকার করে চললো। মালার দেহলতায় আমি প্রলুব্ধ হয়ে পড়লাম।....আমার অন্তর-সত্তায় ভেসে উঠলো পুরুষ-ভাব।....এতো কিছুর মধ্যেও কিন্তু পুঁথির কথা আমায় আঁকড়িয়ে ধরে রেখেছে।—বিল্বমঙ্গলের শেষটুকু কী (?), জানতে চাওয়ার হাতছানিটিও ইশারা দিচ্ছে। মনের দিক থেকে একটু অবশ হয়েই ফিরে এলাম।....আশ্চর্য! মালা যে থেমে ছিল, লক্ষ্য তো ছিল না সেদিকে---

: আপনার জন্যেই থেমে ছিলাম।

আমার এই দুর্বলতার জন্য ভয়ানক 'নীচু' হয়ে রইলাম। নীরব থেকেই 'হার' স্বীকার করলাম।

: অমন হয়, বলে—আবার পুঁথিতে সরে চললো--

"আজ্ঞাক্রমে পুন সেই সরোবর তীরে।
হস্ত ধরিয়া লইয়া রাখিলা ধীরে ধীরে ॥"

—কৃষ্ণ ভজনের যে বাধা, সেই চোখ দুটি তো নষ্ট করে দিলে। বিপ্র এখন বিপদমুক্ত।

"অনুরাগ চক্ষু যার কি করে নয়ানে।
কৃষ্ণ দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলারূপ-গুণ-মধু-মাতি।
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি ॥
মাতোয়ার প্রায় থর থর করি চলে।
বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে ॥"

--বৃন্দাবনে এলেন। ব্রহ্মাকুণ্ডের কাছে গুজরার ঘাটে বসে পড়লেন। মনে তখন শুধু মাত্র একটি আশা, কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

"ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া ॥

রৌদ্রে কেন বসি ভাব ভুকে কেন রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ ॥"

—কে তুমি? আমায় অন্ধ দেখেও ঐ ভাবে কথা বললে। তোমার পরিচয়টুকু জানতে দেবে—?

"কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুঞি।
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞি ॥"

ভকতবৎসল কৃষ্ণ কিন্তু 'লুকোতে' পারলেন না। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও শ্রীঅঙ্গের মদ-গন্ধে—

"সাধু অনুভাবে তত্ত্ব জানি গেলা মনে।"

আনন্দে আপন ভাবে বিভোর হয়ে—

"—হাত ধরি বৃক্ষছায় লহ।
অন্ন আনিয়াছ কোথা খাই তবে দেহ ॥"

চতুর চূড়ামণি কৃষ্ণ তখন—

"—দূরে থাকি বাম হস্ত বাড়াইয়া।
তর্জ্জনী ধরিতে কহে মুচকি হাসিয়া ॥"

ভক্ত বিল্বমঙ্গলের অন্তর-পৃথিবীতে ক্ষণিকের জন্য জ্যোতি-তরঙ্গ খেলে গেল।....বুঝে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণ-চাতুরী—।

"ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি।
হের আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি ॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভক্তকে নিয়ে ডুব দিলেন লীলা রসে—

"পুন কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গি করি।"

তখন বিল্বমঙ্গল—"সাপটিয়া ধরে সাধু অতি দ্রুত করি।"—আর তাঁর ভাব ভাব-সায়রে—

"সুদারিদ্র যেন স্পর্শমণি পথে পায়।

মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ আয় ।।
বহুকাল ক্ষুধার্ত পাইয়া সুধারাশি ।
যেমত আনন্দ পায় তেমত পরশি ।।"

কৃষ্ণ বললেন ভক্ত-সখাকে—

"—ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই ।
কি কারণে ধর তুমি কহ মোরে তাই ।।"

প্রকাশ করলেন বিপ্র তাঁর অন্তর কথা—

"—হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি ।
বান্ধিয়া রাখিব আজ হৃদয়মাঝারি ।।
বহু দুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন ।
পাইয়াছি যদি বা ছাড়িব কি কারণ ।।
পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখন ।
তুমি সে কেমন প্রভু না দেখি এমন ।।"

তাইতো ! এখন করেন কী কৃষ্ণ ? চতুর চূড়ামণির কী বুদ্ধিঃ অভাব আছে (?), তায় আবার নিকটে পেয়েছেন ভক্ত-সখাকে-

"সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিলা ।
আহা মরি বাজে বলি শঠতা করিলা ॥"

ভক্ত প্রাণে ব্যথা বাজলো—

"বেদনা লাগয়ে বলি সাধু চমকিলা ।"

আর ঐ মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ—

"যে হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইলা ।"

শ্রীকৃষ্ণ-মাধবের কৃপা পেয়ে গেছেন ভক্ত বিল্বমঙ্গল ।....
শ্রীকৃষ্ণ মাধবই বলিয়ে নিলেন—ভক্তকে দিয়ে—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যতোঽসি বলাৎকৃষ্ণ ! কিমদ্ভুত !
হৃদয়াদ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ।

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি মদীয় হস্ত ছিনাইয়া যাইতেছ, তাহাতে আর বিচিত্র কী? মদীয় হৃদয় হইতে যদি বাহিরে যাইতে পারে, তবেই তোমার পৌরুষ বলিতে পারি।"

আহ্লাদিত হয়ে বললেন ভক্তকে: আমার সাথে সাথে এই নিকটবর্তী ছায়াতে এসো তুমি—

কৃষ্ণ দূরে দূরে যায় সাধু পাছে পাছে ধায়
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে!
চুম্বকমণির সাথে লৌহ স্বাভাবিক রীতে
যেন ধায় যায় তেন মতে।
বসাইয়া বৃক্ষতলা দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা
তেঁহ কহে কভু না খাইব;
যদি মোরে একবার দেখাও রূপের ভার
তবে যাহা কহ সে করিব।

ঃ সে কী? তুমি কী গোপশিশু কখনও দেখনি?....বললেন শ্রীকৃষ্ণ মাধব।

"সাধু কহে কিবা কহ না বুঝিয়া প্রলপহ
গোপসনে কার্য্য যে সদাই।"

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার লীলা রসে বক্র হলেন একটু—

"হাসিয়া নিকটে যায় পুন কৃষ্ণ পিছে ধায়
আনন্দে কৌতুক ভক্তসনে।
নানান কৌতুক রসে খেলয়ে পরমোল্লাসে
সাধু হৃদি হয় বিদারণে॥
সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি দেখিতে না পায় সুধী
চক্ষু অন্ধ মনে ধকধকি।
আন্ধার ঘরেতে যেন কালসর্প হয় তেন
উৎকণ্ঠিত আশা লকলকি॥"

পুঁথির কথাও শুনে চলেছি, আর মনো-মাঝে একটি রসাল ভাবনা নামিয়ে এনে বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির প্রেম-সোহাগের কাহিনীতে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছি ; সাথে সাথে বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়ক—ঐ চিন্তামণিকে····অজস্র প্রণামও জানিয়ে চলেছি।

আমি তখন পাশাপাশি 'এই এতোগুলোর' সাথে, আনন্দে পুলকে, আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের একটি মানচিত্র কল্পনায় খানিকটা এঁকেও ফেলেছি।

এমন সময় শুনলাম মালার কথা, মনোমালার কথা : বলুন তো বড়ো কে ? বিল্বমঙ্গল-না-চিন্তামণি ?

মালার ছলছল চোখের ছায়ায় আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম। অত্যন্ত নিকট হয়ে সামনা-সামনিই তো বসে ছিলাম আমরা।

মালা কিন্তু আমার উত্তরের জন্য বিলম্ব করলে না। পুঁথির পাতায় ফিরে গেল—

"কহে ওহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট নির্দয় কপট শ্রেষ্ঠ
দয়া নাহি তিল আধ তোমা।
দরশন মাত্রে যদি রক্ষা পায় হত নিধি
গত প্রাণ দেহে হয় সমা।।
তাহে তব কিবা খেতি কিবা লাগে কিবা বেথি
কিবা হাসি চাঞ্চল্য প্রকাশ।
পুন কহে ওহে নাথ করি বহু প্রণিপাত
উপায় কি তাহা মোরে ভাষ।।"

—ভক্ত বিল্বমঙ্গলের কথায়····শ্রীকৃষ্ণ মাধব আবার একটু আশ্রয় নিলেন হৃদি-বৃন্দাবনের লীলা-কুঞ্জে—

"কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হাসি শশীর আনন্দ রাশি
কৌতুকী হইয়া পুন কহে।

কালরূপ কি দেখিবে তাহে বা কি সুখ পাবে
বর মাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে ॥"

—এ প্রলোভন কী আর ভক্ত বিল্বমঙ্গলকে টলাতে পারে? তিনি তো ভূমা-সুখের রাশি শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ ভিন্ন····কিছুই দেখেন না এখন। সে জাগতিক অভাব-বোধ চির-বিদায় নিয়েছে। তাঁর মন-পদ্মে আর বসবে না তারা।

বললেনঃ প্রভু! ভক্তি ঠাকুরাণী কৃপা করেছেন আমায়। এই অনিত্য-সংসারের মায়াজাল····আমায় আর ভুলাতে পারবে না।

"যদি মোরে কৃপা কর দান কর এই বর
মোর দুটি চক্ষু দান দিয়া।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিত হইয়া বদনে মুরলী দিয়া
সম্মুখে দাণ্ডাও দেখা দিয়া ॥"

ভক্ত,—'পরীক্ষার' শেষে এসে গেছে—। তাই—
"তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ সুধাময় করাম্বুজ
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।
অপ্রাকৃত দেহ সেই দিব্য চক্ষু হৈল তেঁই
কৃষ্ণরূপ পানের পিয়ালা ॥"

—মনে মনে প্রণত হলাম মালার কাছে। মালা যে বলেছিলঃ আপনার জন্যেই বিশেষ ভাবে নির্বাচিত—।

কিন্তু····এই 'অধিক-লাভ-বোধ' ধরিত্রী হতে আমি কী অন্তর দেবালয়ে প্রবেশ করতে পারবো—?

এই একটি মাত্র প্রশ্নই—তখন, আমায় ব্যাকুল করে রেখেছে। তা বলে····মালাকে 'অসম্মান' করে চলিনি।····আমি কি করতে

পারি তা ? মালার পুঁথির কথায়ও আমার মন ছিল।—

"সম্মুখে রূপের রাশি নিন্দিয়া অসংখ্য শশী
হরি অচেতনে পড়ে ভূমে।
পুলকাশ্রু আদি করি অষ্ট অনুভব ভরি
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে ।।
এইরূপ দরশনে নানাগুণ বরণনে
পরম আনন্দে দিন যায়।
কৃষ্ণ নিজ ভুক্ত শেষে দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে
দোনা ভরি নিতানি যোগায় ।।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণমাধব ভক্ত বিল্বমঙ্গলকে তো 'অমৃত-পথে' নিয়ে চললেন—।....এই—অমৃত-পথ সহায়ক যে চিন্তামণি বেশ্যা....সেই বা পড়ে থাকে কেন ?—তারও তো কিছু 'প্রাপ্য' আছে শ্রীভগবানের দোরে—

"দৈব যোগে সেই রামা চিন্তামণি বেশ্যা নামা
কৃষ্ণ কৃপা তাহার উপরি।
সকল করিয়া দূরে কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ভরে
আসি মিলে বৃন্দাবন পুরি ।।"

—বিপ্র বিল্বমঙ্গলকে বিদায় দিয়ে কি বেশ্যা চিন্তামণির প্রাণে সুখানন্দ ছিল ?—ছিল না....সে—বেশ্যা ; বহু পুরুষ মানুষের সাথে তার 'যোগ' হয়েছে বিপ্র বিল্বমঙ্গলকে যখন দেহ দিত, সে সে সুখ-অনুরাগ তো উপলব্ধি হতো 'অন্য' ভাবে—।....বুঝতো চিন্তামণি, বিপ্র বিল্বমঙ্গলের তনু-মন-প্রাণের নিবেদিত অর্ঘ্যকে।

—বৃন্দাবনে এসে....

"সুবৈরাগ্য অনুরাগে শ্রী বিল্বমঙ্গল আগে
আসিয়া মিলিলা চমকিতে।

শ্রী বিল্বমঙ্গল তবে রত্নদর্শী গুরুভাবে
প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে ॥"

—প্রেমের গুরু চিন্তামণি এসে গেছে—। চিন্তামণির অন্তর-লোকে····বিপ্র দেখছেন—চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণমাধব সখাকে ।—

"কৃষ্ণদত্ত অন্নদোনা মিষ্টান্ন পক্কান্ন নানা
খাইতে দিলেন যত্ন করি ।
চিন্তামণি কহে মুঞি খাইতে তোমার ঠাঁই
নাহি আইনু অন্ন হেতা হেরি ।"

: আমি এসেছি কেন জানো ?····

"কৃষ্ণ কৃপা তোমা পরি তুমি শ্রেষ্ঠা অধিকারী
জগত শুধিতে পার হেলে ।
শরণ লইনু মুঞি আর কিছু নাহি চাঞি
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে ।"

একবার 'কৃষ্ণ' নামে যত পাপ হরে—জীবের সাধ্য কি তত পাপ করে ।—ভক্ত মহাজনের এই বাণী চিন্তামণিতে আরোপিত হলো—

"এত কহি চিন্তামণি কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া ।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু হেরি তার প্রেমসিন্ধু
আনন্দে মগন হইল হিয়া ।"

রাত্রি গভীর হয়েছে অনেক ।

মালার স্বর—'সুর' হয়ে····আমায় জাগিয়ে রেখেছিল ।····হঠাৎই, পুঁথি হতে এমন একটি ভক্ত কাহিনী শোনাবার আগ্রহ····কী কারণে দেখা দিয়েছিল মালার মধ্যে ? মালা কী আমায়····

: প্রেমধন পেতে চান তো ?

মালার কথা—শুনলাম আমি ।

আবার বললে মালা : পৃথিবীর জন্ম যেদিন থেকে, সে অবধি আজ পর্যন্ত—কোনো নারীকে প্রেরণা দিয়ে····কোনো পুরুষ—'বড়ো' হবার পথে এগিয়ে দিয়েছে বলতে পারেন ?

আমি নির্বোধ হলেও, মালার এই কথাটুকু বুঝে ফেললাম।

····'ওদিকে' নিতে চাইলাম না মালাকে।

বললাম : আরও একটু নিশ্চয়ই পুঁথিতে আছে। ওটুকুও শুনিয়ে দাও।

মালা বললে শুধু : আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—

"চিন্তামণি অধিকারী ভক্ত অনুরোধ ভারি
দুই তত্ত্বে দিলা দরশন।
আহা কি আশ্চর্য্য কথা প্রফুল্ল সৌভাগ্য লতা
দুজনার একই সমান ॥"

[চার]

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতু, কুর্বন্তে সর্বে মম সুপ্রভাতম ॥ ১ ॥
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা ॥ ২ ॥

মালাকে আচার্যদেব তো বেশ শিখিয়ে চলেছেন।

সূর্যোদয়ের চার দণ্ড পূর্বে—ব্রাহ্ম মুহূর্ত।····এই সময়ে উঠতে হয়. বিছানায় বসে উত্তর বা পূর্বমুখ হয়ে পাঠ করতে হয় মন্ত্রগুলো।

ভাগ্যিস—এই পথে চলেছিলাম কুসুম-চয়নে। এই পথ মালার সাধন কুটীরের একেবারে অতি নিকট হয়ে চলে গিয়েছে পুষ্প-উদ্যানে।

বহু যত্ন, পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়ে এই পুষ্প-উদ্যান তৈরী করেছিলাম আমরা। অবশ্য, বনমালীর উৎসাহই ছিল সবার বেশী।

....সময়টি কিন্তু যথাযথ ব্রাহ্মমূহূর্ত ছিল না —। ঊষা পৃথিবীর কূলে তরণী ভিড়িয়েছে সবে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মানুষের মন যে কতো কথা বলে!....আমি অবশ্য এখন মনের কথা শুনলাম না।....মন আমার বলছিল: আরও একটু নিকট হও না কেন (?), জানালা-পথে দেখে নাও না মালাকে (?)

সত্য বলতে কি—ইচ্ছেও হয়েছিল প্রথমে। আবার আমার পুরুষ দেহের সম্মানটি জানিয়ে দিয়েছিল তৎক্ষণাত: মালার আঁখি-আলোয় এসে যাও যদি?

জানা হলো না,—মালা কোন মুখে বসে আছে, উত্তর-মুখে না পূব-মুখে।

কান দুটোকে পেতে দিলাম....মালার অতি ধীর স্বরে আবৃত্তি করা মন্ত্রধ্বনিতে—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥ বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম॥ ৪॥

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।

পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥ ৫॥

আর বিলম্ব করা উচিত নয়।....আমি তো চলেছি আমার কাজে, পুষ্প-চয়নে।

আশ্রম বিগ্রহের ভোগরান্নার কাজে ওকেই নিয়োজিত করেছে মালা। মনোমালা।

অর্চনা আচার্যদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী।....আমি যখন আশ্রম ছেড়ে চলে আসি, তার মাত্র কয়দিন পূর্বেই ওর বিয়ে হয়। বর-পক্ষ বরকে নিয়ে এসেছিলেন আশ্রমেই। আশ্রমেই সম্প্রদান করেছিলেন আচার্যদেব। অর্চনা তো বড়ো হয়ে ওঠে আচার্যদেবের কাছেই। আশ্রমে।

আচার্যদেব প্রায়ই বলতেন 'কর্ম-রহস্য' এমনই এক বাস্তব ব্যাপার যা তোমার জীবনের সবখানিকে এক নিমেষে ওলট-পালট করে দেবে।....আচার্যদেবের জীবনেও তাই ঘটেছিল। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগী হবেন—এমনই প্রস্তুতি চলছিল, এমন সময়ে ছোটো ভাই মারা গেলেন। ভ্রাতৃবধূও নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন এক মাসের মধ্যেই।....হয়তো স্বামী-শোকে, অথবা নিয়তির অমোঘ বিধানে,—সে প্রশ্ন তুলে আর এখন লাভ নেই।....অর্চনা তখন বছর চারেকের মাথায়। গৃহে আর যখন কেউই নেই, 'আশ্রমে'—পরিণত করলেন গৃহটিকেই।....মানুষ দুজন মাত্র। উনি আর অর্চনা।....এমন সময় সন্ন্যাসী এক এলেন একদিন। বললেন : একমনা হয়ে যদি সাধন-সমরে ডুবতে চাও, বিয়ে করতে হবে তোমাকে।

—এ কী বলছেন আপনি।

সন্ন্যাসী বললেন : তোমার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যেই ও-কথা বললাম—

—কিন্তু....

: কোনো কিন্তু নয়। তুমি জানো না যা, তাই শুনে রাখো। তোমাকে আশ্রয় করে একটি জীব এই ধরণীতে আসতে চাইছে—তার কর্ম-চক্র পূর্ণ করতে।....সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখে বিতৃষ্ণা এসেছে তোমার। তাই ছোট ভাইর বিয়ে দিয়ে, তাকে

সংসারী করে, মনে মনে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলে। ভাই-য়ের বিয়ের পর চার-চারটে বছর ধরে—ঐ, এক ধারায় মনকে গড়িয়ে দিতে চেয়েছ।....তোমার সঞ্চিত কর্ম আছে কিছু।.... একটি জীবের সাথে 'কর্ম-সূত্রে' বাঁধা আছ তুমি। তাকে যে এই পার্থিব-পৃথিবীতে জন্ম নিতেই হবে—। সে অপেক্ষায় আছে—

আচার্যদেব বিবাহ করলেন।....সে 'জীব' হচ্ছে—মালা। মনোমালা।

আশ্রমবাসকালীন একটি প্রশ্ন করেছিলাম আমি : আমি যদি অহরহঃ শ্রীভগবানের চিন্তায় ডুবে থাকার চেষ্টা করে চলি, ও-তে কী 'সঞ্চিত-কর্ম' ক্ষয় হয় না ?

আচার্যদেবের মুখে এই প্রশ্নের উত্তরে শুনেছিলাম : সঞ্চিত কর্মের মধ্যে এমন সব কর্ম থাকে—যার ক্ষয় হবে একমাত্র শুধু ভোগের দ্বারা। কিছুকাল হয়তো শ্রীভগবানের নাম চিন্তায় ডুবে রইলে, কিন্তু—তারপর আর পারবে না। স্থিরতার সে 'মধু' না পেতে পেতে বিরক্ত হয়ে উঠবে।....যে সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তুমি 'ঝুলে' রইলে। সে কর্ম-পথ পরিষ্কার হলে—তবে....তোমার 'ঊর্ধ্বগতি'।

বুঝিনি সেদিন।....তাই, আশ্রম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। আবার কেন জানি আসতে হলো আশ্রমে।....এবার আমার একমাত্র লক্ষ্য—কী সে সঞ্চিত কর্মটি ? যা আমায় আশ্রম ত্যাগের পর কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয়নি। আবার ধরে এনেছে আচার্যদেবের আশ্রমে।—

আশ্রম-মন্দিরে বসে আছি—। হাতে রয়েছে পুঁথি। একটু

যেন নিঃসঙ্গই বোধ হচ্ছিলো। একা-একা লাগছিল নিজেকে। ....যৌবনের দাবীতে জড়িয়ে পড়ছি কী....

ঃ আপনার কুটীর দেখলাম ফাঁকা। ভাবলাম—কোথায় যেতে পারে মানুষটা?

—ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু তোমায় খবর দিয়েই মন্দিরে আসি।

ঃ তাই করলে পারতেন। অযথা আমায় হয়রানি হতে হতো না—

বললাম ঃ সত্যি, একটুখানি ভুলই হয়েছে।

—একটুখানি নয়, অ-নেকখানি ভুল করেছেন আপনি।

বুকে চমক লাগলো আমার।....আমি কেন মালার সামনে সহজ হতে পারছি না? মালা কেমন খুসী-ঝলমল হয়ে কথা বলে—।....আমি—এমন ভাবে....হেরে-যাওয়া সৈনিকের মতো 'করুণ' হয়ে উঠি কেন (?)....আমার—মনের....শোভন-বসতি বিমুগ্ধ করে দেয় কেন আমায়—যখন মালা কাছে আসে!—

মন্দির-বিগ্রহকে ভোজ নিবেদন করে এইমাত্র বেরিয়ে এলো অর্চনা। এসে, আমারই কাছটায় বসলে—। মালাও তো রয়েছে কাছেই।—

এ—সেই অর্চনা!

অর্চনা কিন্তু আমার মনে দীর্ঘশ্বাস এনে দিয়েছিল।....অর্চনা কী চাইতো আমায়?....আমি কী আশ্রম ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম—অর্চনার জন্যে—?....মনের গহ্বরেই পাঠিয়ে দিলাম আমার প্রশ্নগুলো।

—একটু যেন ভাবতে ইচ্ছা হয়।

আমার দিকে মুখ করেই বললে অর্চনা, তার এই কথাটি। কিন্তু....জানতে চাইলো মালা,—বিষয়টা কী?

—এই যে ঠাকুরের সামনে আমরা সবাই ভোগ নিবেদন করি,

ঠাকুর তা গ্রহণ করেন তো ?

একটু যেন সামান্য অ-খুসী হলো মালা : শ্রীগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে পড়োনি—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহ-লোকও নাই, পরলোকও নাই—

অর্চনা বললে : অমন তো অনেক উপদেশই শ্রীগীতায় আছে—

: বেশ ! তুমি সংশয়-মুক্ত হতে পার পুঁথির কথায়।—মালা হাত বাড়ালে আমার দিকে, দিন তো পুঁথি—

আমি পুঁথি তুলে দিলাম মালার হাতে। মনোমালার হাতে।.... মালার আঙ্গুলের ছোঁয়া পেলাম।....আবার আমার মনে সাঁতার খেলে গেল,—'স্পর্শ-চেতনা'র কথা।

পুষ্পে বসন্তের স্পর্শের মত....মালার মুখে পুঁথির কথা আরও অনুরাগ-আশ্রয়ে 'জীবন্ত' হয়ে উঠলো—

"সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র সুন্দর প্রকৃতি।
শ্রীবিগ্রহ সেবা তাহে শুদ্ধ মতি-রতি ॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-আদি নানান প্রকারে।
পরম যতনে ভোগ লাগায় ঠাকুরে ॥"

সেই, সাথে-সাথে বলে চলেন সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ : ঠাকুর ! তুমি আর চুপ করে বসে কেন আছ ? এবার ব্যবহার কর তোমার হাত দুটো। অন্ন তুলে মুখে দাও—

"প্রতিদিন কহে সাধু ঠাকুর না শুনে।
আর দিন বিপ্র কিছু কহে ক্রোধ মনে ॥"

—নিত্য তোমার জন্যে এতো পরিশ্রম করি আমি, পরিশ্রমের শেষটুকু আর দেখা হয় না। বুঝতেও পারি না রান্নাগুলো হয় কেমন ! আহার গ্রহণে তুমি স্বাদ পাও-কি পাও না।

"অতএব আজি খাইতে না দিব তোমারে।
পাক করি আজি খাওয়াইব যে শিবারে ॥
তোমার সাক্ষাতে তুমি চাহিয়া দেখিবে।
ক্ষুধায় কাতর হইয়া তখন বুঝিবে ॥"

—সাধু সুবুদ্ধি করলেনও তাই। ঠাকুরের সামনে নানা খাদ্য উপকরণ এনে সাজিয়ে রাখলেন।

—"ধমকায় ঠাকুরেরে কপট করিয়া।
কোনমতে খান যদি তরাস পাইয়া ॥"

তোমার দেখছি ভয় ডর বলতে কিছু নেই। বেশ, এবার বোঝো মজা। তোমাকে খাদ্য গন্ধও পেতে দেব না আমি। নাকে তোমার তুলো গুঁজে দেব।

"এত কহি ছুটিয়া যাইয়া তুলা আনি।
দুই নাসারন্ধ্রে চাপি ধরয়ে অমনি ॥"

: ভক্তের সাথে ঠাকুর খেলা করছিলেন এতোক্ষণ—

"ভকত চরিত্র দেখি দয়াল শ্রীহরি।
হাসিয়া উঠিয়া তবে কৌতুক নেহারি॥
আমি এই খাই অন্ন কারে নাহি দিহ।
অন্নাদি সামগ্রী মোর নিকটে আনহ ॥"

—শ্রীবিগ্রহ ডাক দিয়েছেন।

'ধূলার-ধরণীতে' পরমানন্দে লুটোপুটি খেলেন—সাধু সুবুদ্ধি। তাঁর মনুষ্য-জীবন 'প্রাণের আকাশে' চাঁদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এনে দিয়েছে ভূমা-সুখের ঝরণা-ধারা।

—আর কী বিলম্ব করতে আছে?

ঠাকুরের আজ্ঞাবহ হলেন। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তুলে ধরলেন ঠাকুরের সামনে—

"হাসিয়া হাসিয়া কর-কমলে আপন।
খাইতে লাগিলা বিপ্র হেরিয়া মগন ॥"

[পাঁচ]

—পড়ছিলাম। হাতে আমার 'দক্ষ-সংহিতা'।—

এবারে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তে হলো: কোন বিশেষ মানুষ গৃহে আগমন করলে—মনে, চোখে, মুখে ও কথায় সৌম্য ব্যবহার করবে অর্থাৎ ভদ্র ব্যবহার করবে অত্যন্ত খুসী হয়ে; বিরক্তি প্রকাশ করবে না কোন প্রকারেই। উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলবে, স্বাগত জানাবে। মিষ্টালাপ করবে। ভোজনাদি দ্বারা উপাসনা বা সেবা করবে ও সবশেষে তার চলে যাওয়ার সময় কিছুদূর অনুগমন করবে। (প্রথম নবক-গৃহস্থের ন'টি সুধা।)

—ওঃ! আমি ভাবলাম কি-না-কি পড়ছেন।

অর্চনার কথায় আমার মন একটু সঙ্কোচ বোধ করলো। অর্চনার সাথে তো আমার এই প্রথম জানাজানি নয়। প্রথম দিককার আশ্রম জীবনে তো অর্চনার সাথেই যোগ ছিল বেশী।···· অর্চনা একটু অন্য 'জাতের'।····তা বলে মালার সাথে যে কথা বলতাম না, এ-ও তো নয়। তবে····

: আপনি আশ্রম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আমি শুনেছিলাম। আবার এলেন যে—?

—মানুষের ইচ্ছাই তো সব নয়—।

বেশ—কেমন একটি মায়াময় গন্ধ ছড়িয়ে উত্তর দিলে অর্চনা: এবারে আপনি সত্যি-সত্যি সংসার ত্যাগী হতে চলেছেন—

বললাম: কেন? যারা সংসারী—তারা কী ভাবে মানুষের ইচ্ছাই সব—?

ঃ ধেৎ! আপনার সাথে কথা বলে সুখ নেই। এলাম সময় কাটাতে, আর আপনি খাপছাড়া সব কথা বলতে আরম্ভ করলেন—

থামলো একটু। দমভোর নিঃশ্বাস নিল। তারপর, আলো-হাওয়া হয়ে খেললে আমার সাথে ঃ আমি এখন আপনাদের আশ্রমে বিশেষ মানুষ।....কেমন তাইতো? ভদ্র ব্যবহার করবেন আমার সাথে খুসী হয়ে। কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ অবিধেয়—।

অর্চনা চলে গেল —

অর্চনার জীবন-ক্ষুধা অন্য দিকে। কতো কথাই তো হতো অর্চনার সাথে। আচার্যদেবের আশ্রমে কোনো বাধা-নিষেধ তো ছিল না। অবশ্য আমাকে নিয়ে এ-কথা। আচার্যদেব আমায় দেখতেন পুত্ররূপে। আমিও ওদের কাছে ভাইয়ের মত সতর্ক থাকতাম।....মাঝে-মধ্যে অ-সাবধানী করে দিত অর্চনাই। অর্চনাই আমার মনের-বাঁধে ফাটল ধরিয়েছিল একটু। অর্চনাই আমায় আশ্রম ছেড়ে যেতে বাধ্য করিয়েছিল। না।....অর্চনারও অপরাধ নেই কোনো।....আশ্রম-জীবনে এসে আশ্রমবাসী হয়ে আমিই বা অজ্ঞাত-অন্ধকারে হড়কে যেতে চলেছিলাম কেন? তবে কী বয়সের দোষ? হয়তো বা তাও হতে পারে।

তা হলেও....

আমার জীবন-চিন্তায় অনেক-অনেক নানা ভাবের গবেষণা এসে প্রবেশ করতো। কেন জানি....নানা ভাবনা নিয়েই থাকতে ভাল লাগতো আমার।

আজও ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগের ভার অর্চনার ওপর। মালা, মনোমালাই যেতে চেয়েছিল তার নিত্য-কর্মে। অর্চনা বলেছিল ঃ তোমার পুণ্য আমি কেড়ে নিচ্ছি না। আজও ইচ্ছে হচ্ছে....ঠাকুরের সেবায় ব্যস্ত থাকি।

দুই বোনে যখন কথা হচ্ছিলো, আমিও ছিলাম। মালা ছবির মত স্থির হয়ে কথা বলেছিল : তোমার অধিকার তো সবার আগে। আশ্রমের প্রথম মানুষ তো তুমিই।

অর্চনা উত্তর দেয়নি কোনো।

মধ্যাহ্ন-বেলা।

মন্দির-বারান্দায় বসে আছি, আমি ও অর্চনা। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে আমাদের।

মালা প্রতিদিনই এ-সময়টায় বিশ্রাম নেয়।

ঠাকুরের বৈকালী সাজিয়ে থালা হাতে মালা এল।....আমাদের দুজন-কেই দেখলে। বললে : আশ্রমে একসাথে ছিলেন অনেক দিন। তাই ছাড়াছাড়ি হতে মন চাইছে না, কেমন? আবার বললে : পুঁথি হতে আর একটি ভক্ত-কাহিনী বেছে রেখেছি। বৈকালীটি নিবেদন করে দিই ঠাকুরকে ; তারপর পড়া যাবে—।

মালার কথার সহজ-সুরে আমি কিন্তু প্রবেশ করতে পারিনি। চমকিয়েই উঠেছিলাম খানিকটা।....শান্ত হই শেষ কথাটিতে। এখন হতে প্রশ্ন একটি জেগে রইলো মনে—। আচার্যদেব ফিরলে, জেনে নিতে হবে—উত্তরটি।

মালা এলো। আমাদের সামনে দাঁড়ালে। কিন্তু.... মালার হাতে তো পুঁথি দেখছি না (?)

বললাম : ভক্ত-কাহিনী পড়ে শোনাবে না?

—ঐ যাঃ। দেখুন তো, ভুলে গেছি—।

আবার মন্দিরে প্রবেশ করলে মালা। সাথে-সাথেই বাইরে এলো। আমাদের অতি নিকট হয়ে বসলে। বললে : ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেন কি-না, তা নিয়েই কাহিনী।

বুঝলাম, অর্চনাতে····বিশ্বাস আনতে চাইছে মালা।····অর্চনা নীরব হয়ে নতি স্বীকার করলে : ভক্ত-কাহিনী 'জাগিয়ে' দেয়—

আমি বললাম : 'জাগতেই' বা চায় কয় জনা ?

আমায় উৎসাহ দিলে মালা, মনোমালা : অনেক সময় সাহায্য করে পরিবেশ।

অর্চনা শুনলো। সে বললে শুধু : 'ভিতরেও' কিছু থাকা চাই। নতুবা, পরিবেশই বা কতোদিন 'ধরে' রাখতে পারে।

অতি সহজ-সরল কথা একটি শুনতে পেলাম। হতে পারে ····অর্চনা অন্য 'জাতের'।····আশ্রমেই তো মানুষ। আশ্রম-শিক্ষা কিছু তো থাকবেই।····এই অবসরে—আমায় নিয়েও একটু 'বিচার' করে নিলাম····আমি।

: আমি এবার 'অগ্রসর' হই, কী বলেন ?

সায় দিলাম। পুঁথির পাতায় মালা অগ্রসর হলো—

"বামদেব নামে সাধু ছিপি-কর্ম করি।
কালগুঞ্জরান করে কৃষ্ণে মন ধরি ॥"

কিন্তু····বামদেবজীর মনে একটি-অশান্তির কারণ ঝুলে থাকে—।

····ঘরে তাঁর বাল-বিধবা কন্যা রয়েছে যে—।

কন্যাটিকে ভক্তি-তত্ত্ব শিখিয়েছেন বামদেবজী। শ্রীবিগ্রহ সেবা নিয়েই থাকে সে।····বামদেবজীর কন্যার সেবা-পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি 'বর' দিতে চাইলেন—

"অল্প বুদ্ধি মুগ্ধ কন্যা দেখিয়া অন্যেরে।
মনে সাধ হইল একটি পুত্র হইবারে ॥"

শ্রীহরি বললেন : তাই হবে। ছেলের মা হবে তুমি।

"বিনা পুরুষের সঙ্গ গর্ভিনী হইলা।"

বামদেবজী তো জানতেন না এ সব-

"বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কানাকানি।
বামদেব লজ্জায় না মুখে সরে বাণী ॥"

ঠাকুরের কাছে আছাড়ি-পাছাড়ি খেয়ে কাঁদতে লাগলেন। এ কী তুমি করলে শ্রীহরি? আমি এখন সমাজে বাস করি কী করে!

"নিদ্রাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে।
তব কন্যা দুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে ॥
মোর বরে তোমার কন্যার হইল গর্ভ।
মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব ॥"

সময়ে কন্যাটি পুত্র-রত্ন প্রসব করলেন।....নাম রাখা হলো নামদেব। বড় হতে লাগলো শিশু।....এ—অন্য ভাবের যেন বোধ হচ্ছে—!

"অন্যান্য বালক অন্য বাল্যচেষ্টা করে।
নামদেব কৃষ্ণ সেবা ক্রীড়ায় বিহারে ॥
মাতামহ-স্থানে পুনঃ পুনঃ কান্দে কহে।
মুঞি কৃষ্ণ সেবিব নিযুক্ত কর মোহে॥"

বামদেব বলেন: তুমি এখনও বালকের চঞ্চলতায় অবগাহন করো নিত্য। বড়ো হও। বড়ো হলে....শ্রীহরির সেবা কার্য তুমি তো করবেই।

"একদিন বামদেব কোন কার্য্যান্তরে।
গ্রামান্তরে গেলা কহি শিশু দৌহিত্রেরে ॥
দুই তিন দিন মুঞি পশ্চাতে আসিবে।
ঠাকুরের সেবা পূজা দুগ্ধ খাওয়াইবে ॥"

আর পায় কে! সের দুই দুধ কিনে আনলো নামদেব।

"নিজ হস্তে আউটাইতে আনন্দে আপনা।
নিজ দেহ পাসরিলা হৈয়া অন্তর্মনা ॥

মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল উতরে।
শিশু কহে এত শীঘ্র আউটে কি করে ॥"

নিজ-জ্ঞানে পবিত্র পাত্র একটি সংগ্রহ করলো নামদেব।....মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে দুধটুকু ঢেলে দিলে।

"সম্মুখে রাখিয়া কহে দুগ্ধ খাও হরি।
শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি ॥
নতুবা তুলিয়া মূর্ত্তি ধরি শ্রীবদনে।
মৃদু হাস্য কর দুগ্ধ নাহি খাও কেনে ॥"

ও হোঃ বুঝেছি ; আমার সাথে তো তোমার পরিচয় নেই। তাই লজ্জা হচ্ছে তোমার....খেতে পারছো না।

বাইরে চললাম আমি।....এই ফাঁকে খেয়ে নিও কিন্তু!

বাইরে এসে, সামান্য সময় অপেক্ষা করলো নামদেব।....ভাবলে, এতক্ষণে ঠাকুর খেয়ে নিয়েছেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু, না তো! ঠাকুর তো খাননি।....তাহলে দুধটাতেই খারাপ কিছু আছে।

আবার নতুন করে দুধ আনলে।....ঠাকুর এবারেও গ্রহণ করলেন না।

"দাদার নিকট খাও মূর্ত্তি হৈনু দূষী।
মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসী ॥"

দেখবে তখন ঠাকুর....আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে তুমি পাপ....স্পর্শ করবে তোমাতে—

"এত কহি ছুরি এক লইয়া হৃদয়ে।
মারিতেই হরি বাম হস্তেতে ধরয়ে।
দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধ পাত্র উঠাইয়া।
বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া ॥"

নামদেবকে আর পায় কে তখন! মহানন্দে বিভোর তখন নামদেব।....দুগ্ধপাত্রে অবশিষ্ট ছিল কিছু। দাদা বামদেবজীর জন্যে.... ঐ—দুগ্ধ-প্রসাদ তুলে রাখলে।

মালাকে থামালো অর্চনা : ধরে দিলেই তো আর ঠাকুর খান না!

: অচেনা মানুষের সাথে কথা বল তুমি?—মালার এই কথার উত্তরে কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেল অর্চনা।

মালাই আবার বললে : এ জগতে যখন অনেকখানি চেনাচেনি জানাজানি হওয়ার পরে....তবেই তো একজন অন্যজনের প্রতি অনেক কিছুর অধিকার পায় ; ও-জগতেও সেই এক-কথা।....তোমার ভাল-বাসায়, তোমার শ্রদ্ধায়—ঠাকুরকে তুমি কাছে পাবে, তাঁর হয়ে যাবে। ....তোমার ভাবনা 'যেমন' কথা বলবে....'তেমন' উত্তর পাবে তুমি। যাঁকে পেতে চাইছো, তাঁর 'নিকটতম' হতে হবে না?

এবারে উত্তর দিলে অর্চনা : যারা ঠাকুর-ঠাকুর করে না, তারা তো দেখি....আরও ভাল আছে।

: 'ভাল-থাকা' বলতে, কী বলতে চাও তুমি? মালা বলে।

প্রসঙ্গটি পালটিয়ে দিলাম আমি। বললাম : নামদেবের কথা কী ওখানেই শেষ?

আগ্রহ-ভরে উত্তর দিলে মালা, মনোমালা : না।

বললাম আমি : তবে নামদেবই শেষ হোন আগে। আমাদের আলোচনা পরে হবে—।

অর্চনা যেন একটু দুঃখ বোধ করলে। বুঝলাম ওর মুখের কথায় : আমি বুঝতে চাইছিলাম, আপনি—হতে দিলেন না।

মালা যেন শুনেও শোনেনি। পুঁথি হতে পড়ে চললো নামদেবের কথা—

"এই মত দুই তিন দিন নামদেবে।
করয়ে হরির সেবা মনের উৎসবে॥

"এই তিন দিন বাদে বামদেবে আসি।
পুছিল সেবার বার্ত্তা দৌহিত্রে সম্ভাষি ।"

নামদেব বলে ঃ ঠাকুরকে শুধু খাওয়াইনি, তোমার জন্যও প্রসাদ তুলে রেখেছি—।

ঃ কই কই, দেখি—?

পাত্র দেখে বললেন ঃ খুবই দুষ্টু হয়েছ তুমি। নিজে খেয়েছ—আর যেটুকু খেতে পারনি....তুলে রেখেছ তা।

"বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ।
ঠাকুর খাইলা মোয়ে দেহ অপবাদ ॥"

ঃ সে কি কথা! বিগ্রহ—হাতে তুলে ভোজন করেন, এমন তো শুনিনি কখনও।....তোমার কথা যে বিশ্বাসে আনতে বাধে—।

"শিশু কহে হেন কেন কহ অনুচিত।
আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিত নিত ॥"

প্রথমে তো কিছুতেই খেতে চাইছিলেন না। তখন আমি বললাম ঃ "মরিব কইনু মুঞি লইয়া কাঠারি।"— তখনই তো—

"তোবে মোর হাত ধরি হাসিতে হাসিতে।
দুগ্ধ পান কইল মোর আনন্দিত চিতে ॥"

বামদেবজী বললেন ঃ আমায় দেখাতে পার তুমি ?

"শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর।"

পরের দিনই দুগ্ধপাত্র এনে ধরে দিলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন না।....নামদেবের চোখ দুটি হতে....মুক্তা বিন্দুর মত অশ্রু-কণা ঝরে পড়তে লাগলো।....ভয় পেয়ে গেলেন ঠাকুর!—নামদেব যদি মরতে চায় আবার—

"আস্তেব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লইয়া।
খাইতে লাগিলা পুনঃ হাসিয়া হাসিয়া ॥"

আজ—এখন, ঠাকুরের আরতি করলে অর্চনা।—

এবারকার আশ্রম-জীবন অনেক 'রাঙিয়ে' দিয়েছে আমায়।.... আচার্যদেবের এই আশ্রমে....মালা-আমি-অর্চনা....এই তিনজনে মিলে যে ভাবে জীবন যাপন করে চলেছি....

: আপনি মাঝে মাঝে বড্ড আনমনা হন। কেন—বলুন তো?

উত্তর দিতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু পারলাম না। অতি সত্বর মনের সে স্তরে....ফিরে আসা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে—।

মালা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল! আরতি দেখছিল ঠাকুরের। আমার কাছে সম্ভবমত সরে এলো!....তার—ধীর মধুর ভাষ শুনতে পেলাম : নামদেবের আর একটু কথা অর্চনাকে শোনাতে হবে।

মালা—অর্চনাকে, অর্চনা বলেই ডাকে।....আমি ঠোঁটের বুকে তর্জনী তুলে ইশারায় জানালাম : অর্চনা বুঝতে পারবে না তো যে ওর জন্যেই তুমি পুঁথি খুলছো—

—না। তেমন ভাবের মানুষ নয়। ভক্তি-স্রোত ওর মধ্যে আছে। ওর 'জানার' বাসনা অনেক। আমি....আগে আগে ভাবতাম—ও শুধু তর্কের খাতিরেই প্রশ্ন করে।....আমার এই ভুল সংশোধন হয় আচার্যদেবের কাছে। উনি বলেছিলেন : অর্চনা আমার ভাল মেয়ে। সব কিছুতেই ওর বিশ্বাস আছে। প্রশ্ন করে কেবল—ওর বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের-ভিতে দাঁড় করিয়ে নিতে—।

ঠাকুরকে 'শয়ন' দিয়ে অর্চনা বাইরে এলো!—

সন্ধ্যা রাত তখন। নীল আকাশের বুকে চিক-চিক করে তারা গুলো জ্বলছে। তারা-বনে চাঁদও রয়েছে একটি। একটি চাঁদই তো থাকে। চাঁদটিও তার বুকের....কাপড় সরিয়ে অজস্র ধারায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিচ্ছে মর্তের মাটিতে।

মন্দির বারান্দায় একটি কোণায় আমরা তিনজনে গিয়ে বসলাম।—

আমাদের জন্যে বুঝি কিছু বেশী করে জ্যোৎস্না পাঠিয়ে দিয়েছে—ঐ চাঁদ—ঐখানটায়।—

ঃ আর একটু আছে—।

মালা হাতের পুঁথির দিকে অর্চনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

মালার—হাত টেনে···চুমু খেল অর্চনা—আজকের দিনটা খুউব ভাল গেল, না রে—?

আমি বললাম: তুমি আসার পর থেকেই দিনগুলো আরও ভাল যাচ্ছে।

অর্চনা খুসী খুসী হয়ে বললে: আমি যেদিন চলে যাবো, তখন?

ঃ বর পেয়েছিস, না? তাই অহঙ্কার হচ্ছে—

মালার কথায় সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়লো অর্চনার মুখে। ····অর্চনাকে আরও যেন অতি সুন্দর দেখাতে লাগলো। অর্চনা যেন খুব বেশী নরম হয়ে উঠলো।····হাওয়ায় দোল খাওয়া সদ্য-ফোটা ফুলের বুকে অলির মত····অর্চনাও বুঝি আপন মনের বুকে অলি হয়ে দোল খেতে লাগলো বসে বসে।

[ছয়]

অর্চনা····পালটিয়ে যেতে লাগলো।

কেমন যেন হয়ে চলেছে সে।····মালা কিন্তু খুসী খুব। আমাকেও বলে ফেলেছে, এবারে আচার্যদেব যখন আসবেন—আনন্দ পাবেন বেশ। অর্চনার ভেতর সংসার ভাবের 'বীজ' একটু আছে বলেই ওর বিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মালাকে প্রশ্ন করেছিলাম আমি ঃ বিবাহ জীবনে কী ধর্ম হয় না ?

ভয়ানক ভাল উত্তর পেয়েছিলাম মালার কাছে। মালা বলেছিল ঃ বিবাহ জীবনে ধর্ম হয় অতি পবিত্র ভাবে। ধাপে ধাপে সংস্কার-মুক্ত হতে থাকে মানুষ।

এখানটায় একটু রাগিয়ে দিয়েছিলাম আমি মালাকে। পরক্ষণেই কিন্তু মনের অভিসারে মালার বুদ্ধিকে চুম্বন করেছিলাম। মালা যে বলেছিল ঃ 'আত্ম-চৈতন্য' তাড়াতাড়ি জাগে নারীর স্পর্শে। নারীর ভালবাসা সাহায্য করে 'জাগতে'।

আরও অনেক কথা বলেছিল মালা। বলেছিল ঃ নারীর ভালবাসার কাছে....পুরুষের ভালবাসা অ-নেক ছোটো, ব্যর্থ। পুরুষের ভালবাসা স্বার্থদুষ্ট। পুরুষ দূরে দূরে থাকে, থাকতে চায়। এখানে ভিন্ন স্রোতে বয়ে চলে নারী। পুরুষের স-ব কিছুকে সহ্য করে চলে।

আমি আবার চেষ্টা করেছিলাম রাগিয়ে দিতে ঃ তুমি এক তরফা কথা বলছো মালা—

এবারে রজনীগন্ধার মত শুভ্র দেহ-মনটি নিয়ে, শিউলি ফুলের মত নত হয়ে ঝরে পড়েছিল ঃ আপনি এখনও বুঝে উঠতে পারেননি... ভালবাসা কী ? কাকে বলে—ভালবাসা !

মালার কথায় হার মেনেও হার মানিনি আমি।....অন্তরে অন্তরে মালাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম, প্রণামও জানিয়েছিলাম। মুখে কিন্তু বলেছিলাম ঃ আমায় শেখাবে ?....আমার কথা-শেষে পাপ-বোধ জেগে উঠেছিল আমার মনে। হয়তো বা তার প্রকাশও ছড়িয়ে পড়েছিল আমার চোখে-মুখে।

নয়তো মালা কেন বললে ঃ ভালবাসা কোনো অপরাধের আইনে পড়ে না। ভালবাসা পুষ্পের মত সুগন্ধ বিলায়। তবে হ্যাঁ, নিজের বলতে যখন কিছুই থাকবে না....সবই সমর্পণ করে দেওয়া হয়ে গেছে—মনের সে ক্ষেত্রটিই ভালবাসার ক্ষেত্র।....

ক'দিন আগের কথা ও-গুলো।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। মাথার একটু দূরে গৃহ প্রদীপ জ্বলে চলেছিল।

অত্যন্ত অন্যায় করে ফেলেছি।

আশ্রমে এসে অবধি এতো দেরী করে তো কোনোদিনই উঠি না। আজ আমার এ কী হলো? পুষ্প-চয়ন আছে। আমি ফুল তুলে দিই, মালা পুজোতে ব্যবহার করে তা।....আজ বড্ড লজ্জা দেবে মালা। মুখে তো কিছু বলবে না। হাসবে শুধু একটু।

ওর হাসির উত্তরে কী বলবো আমি?

পুষ্প-চয়নে এসে দেখি, বাঁ হাতে সাজি নিয়ে ফুল তুলে চলেছে অর্চনা।

অর্চনা, ফুল তুলে চলেছিল।

আমি, অর্চনাকে আড়াল করে, দূরে দাঁড়িয়ে দেখে চলেছি।.... অর্চনার শরীর হতে ভক্তি-জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে যেন। বেশ লাগছে দেখতে অর্চনাকে কিন্তু!

আমি কী অর্চনাতে মুগ্ধ হয়ে পড়ছি? কই, না তো!

ঃ ফুল-বাগানে পুরুষ কেন?

বুঝে উঠতে পারলাম না, অর্চনা দেখলো কখন!....এগিয়ে গেলাম। খানিকটা তফাৎ হতে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি কী দেখেছিলে আমায়?

অর্চনা বললে ঃ বেশ কথা বললেন আপনি? আপনার কাজটি করছি আমি—আর লক্ষ্য থাকবে না—আপনি আসছেন কিনা!

উপস্থিত মতো কী কথা বলি—তা কুড়িয়ে নিতে দেরী হচ্ছিলো। আমার বাঁশীর সুরে কোন রাগিনীর সর্গম বাজাই (?) পরিবেশটিকে লঘু করি কোন পথে (?) এদিকে শরীরটিও আমার এক পা এদিক ওদিক হতে পারলে না। স্থান-কাল আমায় স্থির করে দাঁড়িয়ে রাখলে।

ফুল তুলে ফিরে চলেছি দুজনে।

অর্চনা জিজ্ঞাসা জানালো একটি।....আমি তো আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না আমার মনের দিক হতে। আমি তখন খাঁচা খোলা পাওয়া পাখীর মত, খাঁচার অন্দরে থেকেই মনো-আনন্দে কিচিরমিচির করে চলেছি—।

জিজ্ঞাসাটি ছিল : পরিবেশ বড়—না, সংস্কার বড় ?

অর্চনা এ ভাবের কথা কেন বলে বসলে (?)....কিছু সময় নীরব থেকে অর্চনাই বললে আবার : এ—'শব্দ-দুটোর' মীমাংসা কিন্তু অত্যন্ত সহজ নয়।

আমি বললাম : তুমি যা বললে, সে-টি সত্য কিন্তু !

—তা হলে তো আলোচনা তোলাই ভুল হলো। অর্চনার কথা।

এতোক্ষণ হেঁটে চলেছিলাম আমি, আগে-আগে। অর্চনা ছিল পিছনে আমার।

পথ তো দূর নয়। কতটুকুই বা পথ। আচার্য জীবনানন্দের আশ্রমের মধ্যেই তো ফুল-বাগান। আশ্রমের মধ্যেই তো মন্দির। আশ্রমের মধ্যেই তো আমাদের থাকার ঘর।

পথ-সামান্য। সামান্য বলেই হেঁটে চলার মাত্রাটি ছিল অত্যন্ত ধীরে।....আমি যে আগে ছিলাম। অর্চনা অনুসরণ করে চলেছিল আমাকে।....ধীর গতিই ভাল লাগছিল তখন। অর্চনার সঙ্গ মাতিয়ে রেখেছিল।....এ-সেই কাম-ক্ষুধাতুর মনটি নিয়ে কোনো নারী সঙ্গ নয়। ....তা হলে কী 'আশ্রম' আমায় 'থাকতে' দেয় (?)

কেমন যেন হয়ে পড়েছি তখন, আমি।....মনে হচ্ছিলো এ পথ যদি অনন্ত-বিস্তৃত হতো ; আমি আগে....অর্চনা পিছনে—এভাবে অনন্তকাল ধরে হেঁটে চলতাম ; পরিবেশ বড় না সংস্কার বড়—এটির কোনরূপ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে শুধু ভেবেই চলতাম শব্দ দুটি ; এ ভাবে হাঁটতে হাঁটতে....আমাদের দুজনার জীবন পরমায়ু

পথেই শেষ হয়ে যেতো ; আবার পরজন্মে কে কোথায় যেতাম....তাও জানা থাকতো না....

ঃ কিছু একটু তো বলুন !

অর্চনা তার কণ্ঠস্বরে সুর ছড়ালো বাক্য দিয়ে।

আমি কিন্তু সুরের সাথে কোনো মীড় যোগ করলাম না।....হাঁটার মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। চলে এলাম মালার ঘরের বারান্দার কাছে। অন্য অন্য দিন যা করি....আজ তা করলাম না। এক লাফে উঠে পড়লাম বারান্দায় ....অন্যান্য দিন তো সিঁড়ি বেয়ে উঠতাম।

আবার শুনলাম অর্চনার গলা ঃ ফাঁকি দিয়ে পালালেন তো !

ঃ অমনই স্বভাব মানুষটার—

কথা বলতে বাইরে এলো মালা।....স্নান তার হয়ে গেছে। একটি নির্মল আনন্দধারা তার চোখে-মুখে ফুল হয়ে ফুটে রয়েছে।

ঃ কিন্তু ওটা তো উচিত নয়—

অর্চনাও তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে।

এবারে আমি আর চুপ রইলাম না।....তখন যেন একটি প্রেরণার ঝরণা-ধারা বয়ে চলেছে আমার অন্তর-মন্দিরায়। বললাম ঃ ফাঁকি দিই নি। অর্চনার কথার উত্তর দেওয়ার সাধ্য আমার নেই—

মালা শুকনো গামছা দিয়ে মাথার চুল শুকিয়ে তুলছিলো। তার কাজে ছেদ পড়লো না। ঐ ভাবে থেকেই বলে বসলে ঃ অর্চনার সাথে কী আপনি পারেন !

অর্চনা বললে ঃ তুই থাম্ তো একটু—।

আমি তখন দেখছি দুজনকেই। মালাকে, মনোমালাকে ও অর্চনাকে।

আজ ঠাকুরের ফল ভোগ দেওয়া হবে। একাদশী যে। এই তিথি পালন আমায় কষ্ট দিত প্রথম দিকে। পেট খালি খালি লাগতো।

শরীরে ঝিমুনী আসতো। বার কয়েক করতে করতে প্রায় অভ্যাসে এসে গেছে এখন।

মন্দির বারান্দায় আমরা তিনজন। মালা, অর্চনা ও আমি। পুরানো—প্রায় ছেঁড়া-ছেঁড়া কতকগুলো কাপড় নিয়ে, মালা কাঁথা সেলাই করেছে একটি। দেখতে অতি মনোরম হয়েছে কাঁথাটি।....তাতেই নক্সা করে চলেছিল বসে। অর্চনা—স্থতোর রঙ মিলিয়ে দিচ্ছিলো।

অর্চনাই বললে একটি শ্লোক :

"আলাপাদ্ গাত্রসম্পর্কাচ্ছয়নাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা।।"

শ্লোক শেষ না হতেই বলে উঠলে মালা : আপনি তো সংস্কৃতে খুব কাঁচা। আমিও তাই। তবে আপনার মত অতোটা নয়। অর্চনা কিন্তু ভাল সংস্কৃত জানে। অনেক সময় কথাও বলে পণ্ডিতের মত। কিন্তু বুদ্ধিতে একটু বোকা—

: তোকে মোড়লী করতে হবে না—

মুখ ঝামটা দিলে অর্চনা।

আমি বললাম : অর্চনার পরিচয় তো জানি আমি। অর্চনার বিয়ের আগে আমি তো এখানে—এই আশ্রমেই ছিলাম।

: আপনিও 'যুক্ত' হচ্ছেন মালার সাথে—

একটু বোধহয় রাগিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো অর্চনাকে। মালার মুখের কথায় তো তাই বুঝলাম। মালা বলে বসলে : কাঁথা সেলাই হচ্ছে, এখানে সংস্কৃত-পর্ব এলো কেন ?

অর্চনা কিন্তু রাগলো না। হাসলো খানিকটা। ওর হাসি দেখে....আগামী অনেকগুলো দিনের ভবিষ্যৎ-কথা ভেবে নিলাম আমি।....ভেবে নিলাম অর্চনাতে 'বস্তু' আছে।....শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সময় ও কাল পূর্ণ হলেই অর্চনা 'ঝরবে'।

ঝরবে ওর জ্ঞান-ভাণ্ড মাথায় নিয়ে 'অমৃত' বিলাতে। এই পার্থিব পৃথিবীতে 'অমৃত' বিলাতে পারবে ও।

বললে অর্চনা: তুই ভাবিস বুদ্ধিমতী কিন্তু এক ছিদামও বুদ্ধি যদি তোর ঘটে থাকতো—

মালা বললে: স্বীকার করে নিলাম তোর কথা। তুই এবারে বুঝিয়ে দে আমায়।....আমার দিকে মালা চাইলে। একটু গম্ভীর স্বরে বললে: আপনার হয়তো বোঝার দরকার হবে না—

পাছে অর্চনার উত্তর শুনতে বিলম্ব হয়, আমি নীরবই রইলাম তাই। বরং অর্চনাকেই বললাম: আমি ও শুনতে চাই তোমার কথা। তুমি বলে যাও—

অর্চনা যা বললে—তাতে হঠাৎ করেই সম্মান জানিয়ে বসলাম অর্চনাকে। বাইরে কিন্তু প্রকাশ করলাম না কিছু। আমার মনের নীরব অভিবাদনের সাক্ষী রইলো একজন। সেই তিনি—যাঁকে আমরা অনেকেই না দেখে থাকলেও....অহরহ স্বীকার করে চলি—'তিনি' আছেন। তাঁর নাম একটিও দিয়েছি আমরা। ঐ নামটি হচ্ছে: শ্রীভগবান।

অর্চনা বললে: তুই কাঁথায় নক্সা তুলছিস। রঙ-বেরঙের সূতো মিলিয়ে এগিয়ে দিচ্ছি আমি তোর সামনে। তুইও যথাযথ স্থানে সূচ দিয়ে ঐ রঙ-বেরঙের সূতোগুলো বসিয়ে দিচ্ছিস—নক্সাকে সুন্দর করতে। এবারে, আগে—শ্লোকটির 'অর্থ' শুনে নে—

—জলে পতিত তৈলবিন্দু যেমন অবিলম্বে বিস্তৃতিলাভ করে সমগ্র জলরাশিকে তৈলাক্ত করে দেয়, ঠিক অমনই পাপী ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করলে, তাদের দেহের স্পর্শ ঘটলে, অথবা তাদের সাথে একত্র শয়ন বা ভোজন করলেও—ঐ পাপী ব্যক্তির পাপ অন্যান্য লোকের দেহেও অবিলম্বে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এ-টি 'নারদ পঞ্চরাত্র' হতে বলেছি।

—এখন শোন্, কেনই বা বললাম। বললাম এই কারণে যে, তুই সুন্দর করে তুলতে চাইছিস তোর কাঁথার নক্সাগুলোকে। ওতে হবে কী? না—প্রায় মানুষের চোখই দেখে আনন্দ পাবে। এর জন্যে তুই রঙ বেছে বেছে যার সাথে যেটি মেশালে ভাল হয়—সেই সেই রঙের সুতোই ব্যবহার করছিস।....মানুষের বেলায়ও তাই। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে—সব মানুষের সাথেই মেশা চলে না। ওতে মনে অপবিত্রতা প্রবেশ করে, মনকে ছোট করে দেয়। মন সর্বদা 'নীচ' চিন্তায় মগ্ন থাকবে। নোংরা-অপ্রয়োজন আলাপ-আলোচনাগুলোই তখন পেয়ে বসবে—মনকে। 'গভীর' কোন কিছুতে মন যেতেই চাইবে না। হালকা কথা, হালকা চিন্তাই চাইবে তখন।

মালা বোধহয় ভাবতে লাগলো কথাগুলো। সূচ-সুতো ওর হাত হতে আপনা থেকেই ভূমি আশ্রয় করলে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিলে নিজেকে। বললে: আজকের এই বিংশ-শতাব্দীর পৃথিবী বিশ্বাস করবে তোর কথা?

অর্চনা বললে: এই বিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে তো তুইও একজনা। তুই বিশ্বাস করিস তো?

: আমার একার বিশ্বাসে কী আসে-যায়।

—বিন্দুতেই সিন্ধু হয়। তোর একার বিশ্বাস থাকলেই হলো। তোর বিশ্বাস তো বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে একদিন।

মালা বললে: তা তো পারে। কিন্তু, সে-ও তো সময়সাপেক্ষ—

অর্চনা বললে: সবই সময়সাপেক্ষ। ফুল গাছে যে অতো যত্ন নিস্, দেখিস না সব ঋতুতে সব ফুল ফোটে না। প্রত্যেকের সময় আছে।

দুই বোনে কথা বলে চলেছে—আর, ব্যথা লাগছে আমার। মালা কথায় এঁটে উঠতে পারছে না। মালা বরাবরই বড় শান্ত। আমার

কাছে তো বটেই। অর্চনা অপেক্ষাও।

আমি দুই বোনের কথা-আসরে একটি 'নুড়ি' ছুঁড়ে দিলাম—

"নারভ্যতে বিঘ্নভয়েন নীচৈ।
রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ॥
বিঘ্নৈ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানা।
আরব্ধমুত্তমগুণা ম পরিত্যজন্তি॥"

বিঘ্ন ভয়ে যারা কোনো কাজ আরম্ভ করে না—তারা অধম। আরম্ভ করে বিঘ্ন দেখা দিলে যারা থেমে যায়—তারা মধ্যম। আর বারবার বিঘ্ন হলেও যারা থেমে থাকে না—তারাই উত্তম।

মন্দির হতে আপন কুটীর অভিমুখে যাচ্ছিলাম। ডাক দিল অর্চনা : ফিরুন, এদিকে আসুন।

মুখ ফেরাতেই দেখলাম মালাকে। মালার চোখে একটু দুষ্টামির আলো লুকোচুরী খেলছে যেন। বুঝতে কষ্ট হলো না আমার—নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে মালার।....কিন্তু, আমায় ডাক দেওয়া করালো অর্চনাকে দিয়ে। নিজে ডাকলেই তো পারতো সে।

মন্দির বারান্দায় আমরা তিনজনে বসেই মধ্যাহ্ন-ভোগের ফল প্রসাদ পেয়েছিলাম। হাল্কা আহার। দেহটিও বেশ হাল্কা বোধ হচ্ছিলো। অর্চনা-মালাকে, প্রসাদ পাওয়ার শেষে চলে যেতেও দেখেছি।....আমার মন তখন বলছিল থাকো না বসে একটু। ছিলামও বেশ কিছু সময়।....মালা যে পুঁথি নিয়ে গেল, তাও লক্ষ্যে এসেছিল।

অর্চনা মালার কাছাকাছি হতেই অর্চনা বললে : নিয়ম ভঙ্গ করলাম না তো?

অন্যমনস্ক তো ছিলাম-ই। অর্চনা কী বলতে চাইছে বুঝে উঠতে পারলাম না। বললাম : নিয়ম ভঙ্গ হবে কেন?

—না, এমনিই বললাম। অন্যদিন তো দুপুরের দিকে আপন কুটীরেই থাকেন কিনা।

ঃটীরেই তো যাচ্ছিলাম! শুনে যাই 'আহ্বানের' কারণটুকু

ঃ আপনার অসুবিধে হবে না তো—

মালার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই মালার কথাটি শুনলাম। এবারেও বোধে ভাসলো—অর্চনাকে নিয়ে কিছু চাতুরী করতে চায় মালা। আমি অনেকখানি অর্চনার হয়েই কথা বললাম ঃ আমার অসুবিধে হওয়ার সামান্য মাত্রও কারণ নেই ; কিন্তু অর্চনার যদি....

থামালে অর্চনা ঃ আমার জন্যে আপনাকে 'যদি' 'কিন্তু' এসব ভাবতে হবে না।

হাসালো মালা এবারে ঃ তুই তো আশ্রমের অতিথি। 'যদি-কিন্তু'তে না থাকলে, তোর যত্নের কম-বেশী হতে পারে তো!

ঃ তোর এই মোড়লী কিন্তু ভাল লাগে না মালা—অর্চনার কথাটুকু শেষ হতেই, ওদের সামনে যে কুশাসনটি ছিল বসে পড়লাম তাতে। বললাম ঃ পুঁথিতেই দুপুরটুকু কাটানো যাক।

অর্চনা শান্ত হয়ে গেছে।

শান্ত-রাগিনীর বাঁশিটিতে ফুঁ দিলে ঃ পুঁথি তো তোর হাতেই তুই পুঁথি শোনা।

উত্তরে মালা বললে ঃ আজ আমি না, তোর মালা।

আমি বললাম ঃ তাই হোক। অর্চনা, তুমিই পড়ো।

অর্চনা বললে ঃ পড়বো। কিন্তু ছোটো একটি ভক্ত-কাহিনী।

বললাম ঃ তোমার যেমন খুশী—

মালা, অর্চনার হাতে তুলে দিলে পুঁথি। বললে ঃ তুই তো এখন বর নিয়ে ঘর বেঁধেছিস ; 'শ্রী বাঁকা পতি রাকা স্ত্রী'—এইটে তোর শোনা উচিত এখন—

: তুই খুউব-ই বেয়াড়া হয়েছিস—

একটু সময় গম্ভীর হয়ে থাকলো।....হাতে পুঁথি। পুঁথির পাতা খোলা।

আমি একবার অর্চনার দিকে চাইছি, একবার মালার দিকে। অর্চনার দিকে আমার চোখ ঘুরে আসতেই : মেঘ-মেঘ হাসির ঝিলিকে ঠোঁট জোড়াটি রাঙিয়ে নিয়ে রঙ ছড়ালো,—তা হলে আরম্ভ করি—?

কাঁপন লাগলো আমার।....আমি মুহূর্তের মধ্যেই আমার প্রথম-দিককার আশ্রম-জীবনে ফিরে গেলাম।....অর্চনা তো তখন কুমারী ছিল!....আবার মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলাম। মুখের শব্দে উত্তর না দিয়ে—চোখের রেখায় জানিয়ে দিলাম : ছোট্ট একটি মনের ভাষা—'হ্যাঁ।'

অর্চনা তার সুকোমল মধুর কণ্ঠে মাধুরী ছড়িয়ে চললো পুঁথি হতে—

"বাঁকা নামে পতি রাকা নামে স্তিরী।
পাণ্ডুর পুরেতে বাস বড় অধিকারী॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্যশরণ।
তৃণ কাষ্ঠ বেচি করে দিন গুজরাণ॥"

—নারদ গোসাঞি তো ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ান বীণা হাতে। কাজেই—এ দুজনার সংবাদও তিনি রাখতেন।....এরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত।

দিন দিন এদের দশা দেখে নারদ গোসাঞির হৃদয়ে 'দয়া' এসে টোকা দিলে। বৈকুণ্ঠে গেলেন। বললেন : তোমার হৃদয় প্রভু বড়ই কঠিন। তুমি তোমার ভক্তকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন? দেখতে পাও না কতো কষ্টে ওদের দিন চলে। গৃহস্থ ঘরে কাঠ বিক্রী করে বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেদের। কোনদিনই পেট ভরে খেতেও পায় না ওরা। তুমি এমন কেন?

"ভগবান কহে মোর দোষ নাহ তাতে"

আমি তো বাঁকা পতিকে ধন দিতেই চাই। কিন্তু বাঁকা পতি যে নিতে চায় না—

নারদ গোসাঞি বললেন : কেন প্রভু? এর কারণটাই বা কী?

ভগবান বললেন : "ধনে পাছে মোরে ভুলে এই তার ভয়।" তোমার হয়তো আমার কথা বিশ্বাস নাও হতে পারে। তোমার সামনেই, আমি, আমার কথার প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছি।

বাঁকা রাকা একদিন যখন কাঠের খোঁজে বেরোলেন—

"সেই কালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রা থলি।
রাখিলেন বনের বাহিরে পথে ফেলি ॥
বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল।
পশ্চাতে যাইয়া রাকা দেখিতে পাইল ॥"

মোহরের থলি দেখে স্ত্রী রাকা ভাবতে লাগলো—

"স্বামী মোর জানিলে তো লইতে না দিবে।"

কী জানি কেন ইচ্ছে হলো মালার দিকে চেয়ে বসলাম। মালা তার হাসিটিকে বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করছে।....বুঝে নিলাম আমি মালার দুষ্টামিটুকু।

মুখ ফেরালাম অর্চনার দিকে। সাথে সাথে ফেরালাম মনটিও—

"ধূলা মাটি চাপা দিয়া এখন ত রাখি।
পাছে কি বিচার করে তেঁহ তাহা দেখি ॥
এত ভাবি ধূলা চাপা দিয়া রাখি গেলা।
দুই জনে দুই বোঝা কাষ্ঠ বান্ধি নিলা ॥"

যেই ফেরবার পথে ঐ স্থানটিতে আসা হলো—

"স্বামীরে কহয়ে এক কথা শুন কহি।"

এক থলি স্বর্ণমুদ্রা পড়ে আছে এখানে। যাবার পথে দেখেছিলাম আমি। ধূলা চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছি—।

"বাঁকা তাহা শুনি কহে ভাল করিয়াছ।
তাহার উপরে ধূলা মাটি যে দিয়াছ॥
উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও।
হেথা হতে চলহ ত্বরা পার হও॥"

শ্রী রাকা ব্যথা পেল মনে।....আবার সান্ত্বনাও নিল কুড়িয়ে। নারীর জীবনে স্বামীই তো সব। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সবই তো স্বামী সেবায় মেলে।....ধিক্কার জানালে নিজেকে, পাপ মন যে প্রবোধ মানে না। 'লোভের' মাঝেই বসতি তার। হে প্রভু! আমার এই পাপ মনকে ক্ষমা কোরো তুমি। আমি যেন স্বামী সেবা বিনা আন নাহি জানি।

নারদ গোসাঞি সব দেখলেন। বুঝলেন।....বললেন শ্রী কৃষ্ণকে: প্রেম সুধারস আস্বাদন করেছে বাঁকা পতি। বিষয়াদি সব ওর কাছে তুচ্ছ। অতীব নগণ্য। সম্পূর্ণ ভাবে মূল্য শূন্য। পূর্ণরূপে অবহেলার সামগ্রী।....যে তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে মতি দিয়ে —ঐ প্রেম সুধারস আস্বাদন করেছে, তার কাছে—

"পুন নাহি কেহ তারে আটকিতে পারে।
প্রাকৃত বিষয় দিয়া-এ তিন সংসারে॥"

আমি—আর, অর্চনা-মালার মাঝে বসে থাকতে পারলাম না। আমায় উঠতে হলো। উঠতে হলো মালার জন্যে। আমায় উঠিয়ে দিলে মালার হাসি—

আমার কুটীরে এসে প্রবেশ করেছি মাত্র, আমার সমুদ্র-মন তরঙ্গ তুললো আর এক দিকে।

—অর্চনার পুঁথি পড়াও শেষ হলো, সাথে সাথেই উঠে এলাম-
অর্চনা ভাবছে না তো কিছু (?)

[সাত]

কয়দিন আমরা সবাই যেন একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়েছি।

আমায় তো আশ্রমে রেখে আচার্যদেব বাইরে গেলেন।....মিশে গিয়েছিলাম মালার সাথে। হ্যাঁ, 'মিশে গিয়েছিলাম'ই বলতে হলো। পারতাম না কিন্তু।....মালা—আচার্যদেবের আত্মজা। কাজে-কাজেই একটু সম্ভ্রম যে পুরু প্রলেপ হয়ে আমার মনের ওপরে বসে ছিল, এটি তো সহজ-স্বাভাবিক।

মালা 'সরে' আসতে লাগলো, একেবারে 'এক' হয়ে যেতে লাগলো আমার সাথে। দূরে থাকি আমি কী করে? তবুও....

তবুও কিছুটা পার্থক্য রেখেই চলেছিলাম। অবশ্য, এমন করে আড়াল রেখেছিলাম আপনাকে যে, মালার 'দৃষ্টিপথে' না পড়ি যেন।

এ ভাবেই চলে-চলেছিল দিনগুলো।

অর্চনা এলো।

এ সেই অর্চনা, যার সাথে আমি পরিচিত।....বেশ অনেকখানি একটু যেন বেশী মাত্রায় প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম অর্চনা অন্দরে।.... কী হলো তারপর? অর্চনা বসলে বিয়ের পিঁড়ীতে।....আমি করলাম কী? আশ্রম ছাড়লাম।....একেবারে?....হ্যাঁ। প্রথমে তো এই মনোভাবটুকুকেই সঙ্গ-সাথী করেছিলাম। মনের বুকে জাপটিয়ে ধরেছিলাম।....পেরেছো?....না। কেন? আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে পারবো না আমার কথা।....বাধা কোথায়? ভাবতে হচ্ছে। এর উত্তর দিতে হলে....

: আমার সাথে, খুড়ী, আমাদের সাথে আড়ী করলেন না-কি ?

চোখে মুখে টলোমলো হয়ে কথা বললো মালা।

আমি—মালাকে, এখন—এখানে ভাবতেই পারি না। অথচ, মালা তো এলো !

: অবাক করে দিলাম না ?

—স্নান করছিলাম আমি আশ্রম-সরোবরে। প্রায় নগ্নই তো ছিলাম। নিজের পুরুষ দেহটি অজান্তে সজাগ করে দিলে আমায়। কিন্তু—

একটুখানিও গোপনে আনতে পারলাম না দেহটি।

আচার্যদেব বলতেন : যে কোন বয়সেরই হোক—নারীর সামনে শরীর খোলা রাখবে না। রাখতে নেই। তুমি ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আছ। বিশেষ করে তোমাকে—এই নিয়ম পালন করতেই হবে।

অতি কাছে চলে এলো মালা—

মাত্র ক'টা সিঁড়ি ওপরে এসে দাঁড়ালো।

: স্নানের সময় নীরব থাকেন না-কি ?

তা-ও কথা সরলো না আমার মুখে। বর্ষার নদীতে নৌকো নিয়ে মাঝিদের এগিয়ে চলার মত, মালা তো কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছে তার কথা নিয়ে।

আমি—না হতে পারলাম সাবধান, না পারলাম অ-সাবধান হতে।....গত ক'দিনের ছাড়াছাড়িতে আমি যে সুদূরে চলে গিয়েছিলাম।....দেখা হতো অবশ্য অর্চনার সাথে, মালার সাথে। কেন জানি, ওদের সাথে কোন কথা নিয়ে এগিয়ে-যাওয়ার প্রবৃত্তিই হতো না। ওরাও দু'বোনে থাকতো চুপটি দিয়ে। কিন্তু কেন ? কেন, এমন থাকছে ওরা ? কথাগুলো যে আমায় ভাবায়নি ; আমি বোধহয় অবহেলার পাত্র হতে চলেছি—; এমন ধারণা যে

উঁকি মারেনি আমার মনোরাজ্যে....সে কথা শপথ করে বলার মত ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু!

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মালা। একেবারে অতি আমার কাছটাতে। বসে পড়লো। হাত বাড়িয়ে দিলে সরোবরের জলে। জল ছিটিয়ে দিলে আমার দিকে একটু।

: উঠুন এবারে আপনি। আমায় নাইতে হবে না? আপনি পূজোয় বসবেন কখন?

মালা বেশ 'রক্ষা' করে চলে আমায়।....বড্ড 'বিপদে' ফেলে দেয়। আবার পরক্ষণেই সহজ হয়ে—আমাকেও দেয় সহজ করে।....মালা কী খেলা করে আমায় নিয়ে?

আপনার কুটীরে চলে এলাম।

আমায় আশ্রম বিগ্রহের পূজো করতে হবে। ভুলেই ছিলাম কথাটি। মনে করিয়ে দিলে মালা।

মালার আবার এ ইচ্ছে প্রকাশ পেল কেন? গতরাত্রে শুতে যাবে,—এমন সময় এসেছিল মালা-মনোমালা, এসেছিল অর্চনা।—

: দরজা খুলবেন একটু!

যথা সম্ভব শীঘ্রই 'কথাটি' শুনেছিলাম। কণ্ঠস্বরে তো বুঝে নিয়েছিলাম অর্চনা বলছে—

: আপনাকে 'কাজ' দিতে এলাম—

এ কথাটি শুনিয়েছিল মালা। মনোমালা।

অর্চনা বলেছিল: আপনি যেন কেমন হয়ে চলেছেন, তাই না? —আমার কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মালা বললে: মানুষটাকে 'ভয়' দেখাস কেন?

সে মুহূর্তেই 'দ্বন্দ্ব-রাজ্যে' প্রবেশ করতে হয়েছিল আমাকে। মালা, না—অর্চনা, কাকে খুসী করি এখন? ঐ চিন্তাতেই তলিয়ে

গিয়েছিলাম।....অতল হতে উঠেও এসেছিলাম। না. সময় নিইনি উঠতে—। দু'টি মাত্র লহমার প্রয়োজন হয়েছিল শুধু।—

—সত্যি, কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে কয়দিন—।

বলেছিলাম এই বাক্যটি। দু'জনার উদ্দেশ্যই।

: তাইতো এলাম আমরা। আচার্যদেব এসে বলতে পারেন, মানুষকে তোমরা আপন করতে জানো না।

গত রাতের এই শেষ কথাটি বলেছিল, আচার্য-কন্যা-মনোমালা।

সারাক্ষণ মালা বসে রইলো। আমার পূজো দেখলো। পূজো তো কিছু-রকম শিখে নিয়েছিলাম আচার্যদেবের কাছে। আচার্যদেবই শিক্ষা দিয়েছিলেন—সেই প্রথম-প্রথম ক'দিন। পরে মন্ত্রগুলো মুখস্ত হয়ে যায়। তখন আর ভারী লাগতো না কর্মটি।

সময় নিতাম না বেশীক্ষণ। মুখস্ত করা মন্ত্র আওড়াতে আর কতটুকু সময়ই বা লাগে!

একদিন আশ্রম বিগ্রহের পূজোয়—বসেছি আর উঠেছি। মন্দির হতে বাইরে আসব—দেখি, আচার্যদেব।

পূজো হলো তোমার?

উত্তর দিতে পারিনি। কেননা, একটুখানি 'জ্ঞান-সেয়ানা' হয়ে পড়েছিলাম—তখনকার ঐ-কয়টি-বছরের বয়সেও।

আমায় হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন: পূজো কী কোনো 'ঠিকের' কাজ? তুমি তো পুরোহিত হতে চলোনি! আত্মজ্ঞান লাভের পথে এসেছো........

ঐখানেই থেমে চলে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ঐ ক'টি কথাতেই আমার 'হয়ে' গিয়েছিল। পরে শুনেছিলাম অর্চনার মুখে: ছেলেটি-কে এখন সামলাতে হবে। শুষ্ক জ্ঞানী হয়ে উঠবে তা না হলে। ....আচার্যদেব বলেছিলেন ঐ কথা। কথাগুলো আমায় পৌঁছে দেয় অর্চনা। অর্চনা কুমারী তখন।

ঃ আমি কাছে থাকলে আপনার ভাল লাগে, না? বাধা দিলাম না নিজেকে। বললাম ঃ বেশ আনন্দ অনুভব করি কিন্তু!

ঃ সাবধান কিন্তু! নারী নরকের দ্বার—শাস্ত্র বলে গেছে।

আমার কিন্তু বেশ লাগলো মালার কথা।....আমি 'অ-নেক দূরে' চলে গেলাম।....আবার ফিরে এলাম অ-নেক কাছে।

আমার মনোজগতেই ঘটে গেল ঘটনাটি। বাইরের জগতেও আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে পড়লো—ঐ ভাবধারা।

খুসীর আঘাতে উন্মনা হলাম। স্বচ্ছ চোখের আয়নায় তুলে নিলাম মালাকে, মালার অন্তর-দেউলের সাথীটিকে।

বললাম ঃ তোমার কাছে তো সাবধান হওয়ার কিছু নেই। তুমি তো আমায় নরকের দ্বারে পৌঁছাতে পারবে না।

ঃ না, না। বিশ্বাস করবেন না আমায়। জোর দিয়ে কথাগুলো বলে, আমি যেন কিছু হয়ে যাচ্ছি........

—তোমার ভ্রম, মালা। তুমিই না একদিন বলেছিলে, নারী হচ্ছে পুরুষের প্রেরণা—

ঃ ধর্ম-পথেও কী তাই?

বলতে হলো ঃ তোমার সত্যিই কিছু হয়েছে মালা। তুমি—তোমার নিজের উপলব্ধিকে ভুলে যেতে চলেছো।

রেকাবী হতে নিবেদিত ফল তুলে খাচ্ছি, তুলে নিলে খেজুর কয়টি—

ঃ আমায় একটা দে। চাইলো অর্চনা।

অর্চনা এসে পড়েছে। মালা দিলে একটা খেজুর। আর একটা খেজুর চেয়ে নিয়ে দুটো খেজুরই মুখে পুরে দিলে।

ঃ আহ্লাদী! পর পর খেলে পারতিস্?

মালার কথার উত্তর না দিয়ে, খোঁচা দিলে আমায় ঃ জানেন না? নিত্য পূজোর পরই ছুটে আসি প্রসাদ নিতে। আমার জন্যে না রেখে,

দুজনে বেশ ভাগ করে খেতে বসে গেছেন—

আমায় বলতে হলো না কোনো কথা। টুপ করে আমাদের মাঝে কথা-বলে ফেললে মালা : তোর হিংস্রে হচ্ছে বুঝি ?

: আসছি আবার।

দু'বোনেই চলে গেল। শুনলাম কিন্তু অর্চনার মুখে।

আমার লোভ হলো একটুখানি। ক'দিন তো পুঁথির পাতায় আমরা কেউই মন দিইনি।

পুঁথি হাতে বাইরে এলাম। আজ একটি ভক্ত-কাহিনী শুনলে হয়! তা মালার মুখেই আরও উজল লাগে পুঁথির কথা।....একটু-খানি দুষ্টামি বুদ্ধিও ঘিরে ফেললে।....সেদিন খুউবই কাহিল করেছে অর্চনাকে, মালা।....অর্চনা তো বিবাহিতা এখন। একজনের বৌ-সে।....অর্চনাকে বড়ো করা যায়—এমন কাহিনী কী নেই পুঁথিতে (?)

বহু পুরাতন পুঁথিটি দেখছি। যত্ন নিয়ে পাতার পর পাতা ওলটাতে লাগলাম।....পেয়ে গেলাম একটি।....কিন্তু (?), কী উপায়ে এই কাহিনীটিই মালার মুখে তুলে দেওয়া যায় !

উপায় এসে গেল কিন্তু !

সুবোধ বালকের মত পুঁথিটি রেখে দিলাম যথাস্থানে।

মন্দির বিগ্রহের দিকে চেয়ে একটু স্থির হতে যাবো....

: এসে গেলাম—। মালা বললে !

অর্চনা বললে : ঠাকুরের অন্নভোগ তো রান্না হয়ে গেছে। আজ কাজে লাগিয়েছিলাম মালাকে। কিন্তু, ভোগ নিবেদনের সময় তো হয়নি এখনও—

আরও হয়তো অর্চনা কিছু বলতো। বলতে দিলাম না আমি। আমার কথা দিয়ে তার কথার-মালা গেঁথে দিলাম। বললাম : অসুবিধে কী ? ক'দিনই পুঁথি পড়া হয়নি। ভোগ নিবেদনের সময়টুকু পর্যন্ত পুঁথি নিয়ে তো বসলে হয়—

: তবে—মালাই পড়ুক পুঁথি।—অর্চনা বললে।—ও আজ ভেগ রান্না করেছে, ওই আজ পুঁথি শোনাক।

স্বাভাবিক গতিতে পূর্ণ হলো আমার ইচ্ছার—অনেকটা। এখনও তো একটু বাকী আছে যে। সেটুকু পূর্ণ হওয়ার পথটি কী?

সে—পথও এসে গেল।

অর্চনা যেন অনেকখানি ঝলমল করছে আজ, খুসীতে। খুসীর আলো ছড়ালো অর্চনা: আপনি তো আমাদের গুরুজন, তায় আবার আশ্রম বিগ্রহের পূজো করে উঠে এলেন। আজ আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য করে নেবো আমরা। আপনিই বেছে দিন কোন ভক্ত কাহিনী।

এ—এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ। পুঁথির পাতা উলটে ধরিয়ে দিলাম মালার হাতে—।

মালা ছিল দাঁড়ানো।—বসলে।....আমি, অর্চনা-ও দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ঘিরে বসলাম—সামনে রেখে মালাকে।....আমার অভিসন্ধি সফল হতে চললো। তৃপ্তির জাগরণে রঙ বদলালো আমার মনে। বড় প্রশান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম মনো-বিছানায়! আমার মনের মধ্যবর্তী পরিসরে ঠাঁই দিলাম অর্চনাকেও। মালার কাছে পাঠালাম লজ্জাবতী লতার কাঁপনটুকু। অতি নিভৃতে, সঙ্গোপনে।....মালা তা জানলো না। তা কী জানা যায় (?)

সঙ্কেতের মত ইশারা দিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলো মালা তার স্বভাবে। এই স্বভাবটুকু নিয়েই তো সে পুঁথি পড়ে চলে—

"মেরতা গ্রামে জন্ম মীরাবাঈ নাম।
রাণা যে রাজার বধু গুণে অনুপাম॥
একান্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অনন্যমানস।
প্রেম ভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ॥

অন্য কথা অন্য চেষ্টা অন্য সঙ্গহীন।
কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি আপনা অধীন ॥"

—অনন্ত রস-ঘন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে চলেন মীরাবাঈ।

"অষ্টকাল যখন যে সেবার নিয়ম।
পিরীতে করয়ে শুদ্ধ হৃদর নিষ্কাম ॥"

—মীরাবাঈ, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত। বৈষ্ণব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এ কথা। ভক্তের অন্তর বেদনার টানে—ছুটে আসে ভক্ত। ভক্তের মর্ম-বেদনা, ভক্তের ভাব-ঘন কথা, ভক্ত ছাড়া বোঝে কে !

"বৈষ্ণব অবারি-দ্বার সদা আইসে যায়।
যথা কৃষ্ণ সেবা তথা বৈষ্ণব সেবায় ॥"

ভক্তরা সব আসে। ভক্ত পেয়ে আকুল হয়ে ওঠেন মীরাবাঈ।

"নৃত্য গীত বাদ্য করে বৈষ্ণব সহিত।
কৃষ্ণ রস রঙ্গে বাঈ সদা আনন্দিত ॥
গান শক্তি অসম্ভব অমৃত-নিন্দিত।
যাতে দ্রবীভূত হইল শ্রীকৃষ্ণের চিত ॥"

আমাকে চলে যেতে হলো একবার বনমালীর কাছে।.... বনমালীর মুখে ভজন গান—কোন তুলনা নেই তার। আবেশে ঢুলু-ঢুলু চোখে মন্দিরা হাতে মীরার ভজন যখন গাইতো সে—

—ঐ গান শুনিয়েই তো পেয়েছিল সে—পাতা-কে। পাতা ছিল তার দরদী-সাথী, মরমী-বন্ধু। এই পাতা-কে নিয়েই বসতো 'বিপরীত-রতিতে'।

—আমায় বলতো: 'যে কোন নারীতে' কিন্তু হয় না এ সাধন। মন-বুদ্ধি-প্রেম-সোহাগ—দুজনারই বইবে একটি মাত্র ধারায়। পরস্পর—পরস্পরকে ছাড়া 'অপূর্ণ' বোধ করবে সদা-সর্বদা। তিলেক যদি দরশন নাহি মিলে—যাক্, এ কথা আর নয়।

বোঝার মত মস্তিষ্ক ভরাট হয়নি তোমার।

'এতোটাতে'—এসে থেমে যেত বনমালী।....আর—আমি, পলকে পলকে উদভ্রান্ত হয়ে উঠতাম।....বাকীটুকু বনমালী কী বলবে না (?)

"বাইজীর গান শক্তি আকবর শাহা।
পাতশা শুনিতে মনে করিল উৎসাহা॥
তানসেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥"

বাদশাহ তো তখন দিল্লীশ্বর নন। তিনি মাধুকরী বৃত্তিধারী বৈষ্ণব একজন। মীরাবাঈর সন্দর্শনে এসেছেন।

"বৈষ্ণব জানিয়া বাঈ সমাদর কৈল।
গান শুনিবারে তবে পাতশা কহিল॥"

মীরাবাঈ স-সম্মানে মেনে নিলেন ছদ্মবেশী বৈষ্ণবের কথা।

"ঠাকুরের আগে বাঈ গাইতে লাগিলা॥"

মীরাবাঈর গান শুনে নাদ-সিদ্ধ তানসেন তো বিস্ময়ে হয়ে গেলেন হতবাক। এতোদিন তাঁর একটি ধারণা ছিল—বর্তমানে সারা ভারতে 'এই সংগীত' বিদ্যায় তিনিই শুধু একমাত্র পারংগম।....নিজের কাছেই নিজেকে ছোটো বোধ করতে লাগলেন—। তিনি।

এদিকে বৈষ্ণবের ছদ্মবেশে সুলতান-ই-দুনিয়া তখন—

"পাতশা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল।
প্রেমাবেশে দুইজন অধৈর্য হইল॥"

মীরাবাঈর কিছু কথা বনমালীর মুখে শোনা ছিল আমার।.... মীরাবাঈকে—কতোদিন যে কতোভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বসেছি।....সেই কথা-পায়রাগুলো....নানা রেখায় ওলট-পালট খেতে খেতে

আমায় আরও তন্ময় করে দিতে লাগলো। আমি—কোনোদিনই না দেখা মীরাবাঈকে....যেন 'দেখতে' লাগলাম। মীরাবাঈ আমার চোখের সামনে নৃত্য করে চলেছে যেন।

—সে এক—কী....আনন্দ উন্মাদনায় বিভোর হয়ে পড়েছি তখন।

এতো বহু কিছুর মধ্যিখান দিয়েও কান পেতে রেখেছি....মালার দিকে কিন্তু—!

"পাতশা চলিয়া গেলা তবে রাজা রাণা।
অন্দরে বৈষ্ণব যাওয়া করি দিল মানা॥"

এ-টুকুতেই কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না—মীরার পার্থিব-পতি।

"বধূ ভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া।
চুটিয়া কাটিতে গেলা তলোয়ার লইয়া॥"

—মানুষ তো ভ্রমের-ঘরে....'দাস'। অহংবুদ্ধি সর্বস্ব হয়ে বিধাতার উপরেও নির্দেশ-নামা উপস্থিত করে—এনে।

—ভাবে তখনমানুষ—বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ সে ; সেই—একমাত্র... একজন। তার 'বোধ' প্রতিষ্ঠিত সত্যের উপর।

—হয় কী ?........

—ভেঙ্গে—ভেঙ্গেও, 'ভাঙ্গতে' চায় না মানুষ। দেখে—দেখেও 'দেখতে' চায় না। শুনে—শুনেও, 'কালা' হয়ে থাকার ভান করে।

....কিন্তু করে কেন ?

উপায় থাকে না বলে। অহং-কে....স্বেচ্ছায় ভাঙ্গতে—দেওয়া যায় না যে !

"বাঈজীর উপরে গিয়া তলোয়ার হানিল।
কাটিবার থাকু কাজ অঙ্গে না ফুটিল॥
বিষ-আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয়।
হরির ভকত জনে বিঘ্ন কে করয়॥"

এ কী? মালার দিকে আমি চাইতে পারছি না যে। কী এক স্বর্গীয় লাবণ্যে আলোময় হয়ে উঠেছে মালার মুখ-কুসুম।

....চোখ চলে গেল অর্চনার দিকে। অর্চনাও যেন....আকুল হয়ে দেখে চলেছে মালাকে।....চেষ্টা করলাম কতো! কিন্তু না, অর্চনাকে টানতে পারলাম না অন্য দিকে।

কী চেয়েছিলাম। কী হলো! মীরাবাঈর কথা শুনিয়ে....

একটু গরম পানীয় কিছু খাওয়াতে পারলে হয় মালাকে। স্পর্শে মালা যে নরম হয়ে উঠেছে!

....অর্চনার কথায় উঠে গেলাম আমি।

[আট]

বেশ কিছুদিন আমরা আশ্রমে আছি দুজনে।

অর্চনা চলে গেছে তার পার্থিব-পতির সাথে। ভদ্রলোক নিজেই এসেছিলেন। আমার সাথে ভাব হয়ে গেছে তাঁর। আমি তাঁকে আপন করে নিতে পেরেছি।

অবশ্য, পারতাম না, যদি না অর্চনা একটু এগিয়ে দিত। ভদ্রলোক যে বড্ড লাজুক মানুষ।

মালা—কী কম রসিকতা করেছে!

অর্চনার বরের সাথে কথা বলার সময়—বাইরের কোনো মানুষজন থাকলে—অন্য অনেককিছু ভেবে নিত। ভেবে নিত মেয়েটি যে ব্রত নিয়ে আশ্রম জীবনে দিনাতিপাত করে চলেছে—ও একটা বাহ্য আবরণ মাত্র।

মালার সাথে থেকে—মালাকে বুঝাতে পেরেছি, এ দাবী আমি করি না।

এখন আমার একটি স্থানে বড্ড বিস্ময় বোধ জাগছে কিন্তু! পাছে আমিও 'অন্য-মতো' ভেবে বসি,—এ কারণেই কী মালা আমায় পড়তে দিয়েছিল : উপনিষৎ বলেছেন, যাঁরা অবিদ্যাকেই, সংসারকেই এক মাত্র জানে তারা অন্ধকারে পড়ে।

আবার যারা বিদ্যাকে, ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্নকরে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে।

একদিকে বিদ্যা আর এক দিকে অবিদ্যা, একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর এক দিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেইখানেই আমাদের আত্মার স্থিতি। (রবীন্দ্রনাথ)

অশোক-কুঞ্জে বসে আছি।

মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি আকাশটাকে।....পূর্ণিমা তিথি আজ।

মন্দির হতে এ-দিকে আসার সময় মালাকে তো বলে এসেছি।

—আমিও এলাম ব'লে, আপনি এগোন্।—এই উত্তরটিও শুনেছি কান পেতে।

সময় তো বেশ কিছুক্ষণ কাল গর্ভে পড়ে গিয়েছে। অথচ....

: আপনি একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়েন—

মিষ্টিমুখের মিষ্টিকথা শুনলাম। বললাম না কিছু। কেবল অ-নেকখানি 'আনন্দ-উষ্ণতায়' আমি কাহিল হয়ে পড়লাম।....মালার সমীরণে আমার বাতাস মিশিয়ে দিলাম। বসতে বললাম মালাকে।

মালা আমার অতি কাছটায় এসে বসলে।....বেদীতে তো বসে আছি আমি। মালা মাটির দিকে দু-পা ঝুলিয়ে পা দোলাতে লাগলো। হাতে দেখলাম পুঁথিটিও রয়েছে।

তার মনো-আনন্দে পাচ্ছি গোলাপ-সুবাসের মত মদিরা-ভরা ঝাঁঝ খানিকটা। এক-বেণীতে কেশ বেঁধেছে। বেণীর মাঝখানটায় গুঁজে দিয়েছে দুটি গোলাপ—পাশাপাশি।

জীবনে—অনেক পূর্ণিমা-তিথি তো দেখা আমার। চাঁদের ঐ মায়া-ভরা জ্যোছনাকে যে চুটিয়ে উপভোগ করিনি, তা-ও-তো নয়। আমার তো মনো-পাল্লায় মাপা হয়ে আছে—কতোটা জ্যোছনা ছিটিয়ে দেয় ঐ দূরের চাঁদ....মর্তের মাটিতে।

আজ চাঁদ তার নিজের কাছে কিছু রাখেনি বোধহয়! সবটুকু জ্যোছনাই ছুঁড়ে দিয়েছে সে।....তার তো ভয় নেই কোন। সময় বুঝলে তো....আবার কুড়িয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখবে জ্যোছনাকে ....আপন বুকের কোমল-আশ্রয়ে।

মালার কেশে—আবার চোখ....গেল। দেখলাম গোলাপ দুটিকে। দেখতে সাহায্য করলে—চাঁদের ঐ লজ্জা-নাই—মেয়ে, জ্যোছনা।

একটি গোলাপ: উজ্জ্বল কমলাছোঁয়া লাল। ওর মধ্যেই আবার গাঢ়তর রঙের ছোপও আছে।

অন্য গোলাপটি: গৌরবর্ণ—ছুঁই-ছুঁই উজ্জ্বল শ্যাম।

বেশ অনেকদিন আগেকার একটি দিনের কথা....আমার স্মৃতি ডেকে আনলে আমার কাছে।...অমনই দুটি গোলাপ তো দেখেছিলাম পাতার পদ্মকলির মত আঙ্গুলের ফাঁকে। সামনে বনমালীও তো ছিল দাঁড়িয়ে। ঐ একটি দিনই তো পাতাকে দেখি।.... বনমালীর মুখ-অধরে ছিল মধু-ঝরা হাসি একটু। চোখের ভাষায় ছিল গর্বে-ভরা কোন দিগ্বিজয়ের কাহিনী।

: কোন কথা তুলুন—

ঝিরি ঝিরি বাতাস পাঠালে মালা, তার কথা দিয়ে।

আমি আমার মিনতি দিয়ে প্রশ্ন করলাম একটি—মালাকে।

মালা তার জ্ঞান-সায়রে সাঁতার দিয়ে চললো—

: বর্তমানের বিজ্ঞানকে ভালবাসুন, আমি কোনোদিনই....নিষেধ-মানা করবো না তাতে।

—তবে, চাঁদকে নিয়ে 'অন্য-কথায়' যাবেন না কিন্তু! চাঁদ আছে বলে....মানুষ বাঁধ ভাঙ্গে....খুসীর বন্যায় এগিয়ে চলে শব্দ করে।

ঃ তুমি পুরাণের কথা বলছো?

—হ্যাঁ। চাঁদকে পুরাণের মধ্যেই সুন্দর লাগে।....একটু থেমে, আমার আরও কাছে সরে এলো। পা দোলাতে দোলাতে বললেঃ শুনবেন সে কাহিনী কিছু?

আমিও তো চুপিসারে এই চেয়েছিলাম। বললাম ঃ বলো তুমি—

ঃ বলে চললো মালা, মনোমালা—

—অত্রি ঋষির পুত্র চাঁদ। এখন আকাশই ওনার ঘর বাড়ী। এঁর রথে মাত্র তিনটি চাকা রথটি সূর্যের রথের চেয়ে ছোটো। কিন্তু সূর্যের রথটি টানে সাতটি অশ্বে। আর চাঁদের রথটি টানে কতো অশ্বে, জানেন? দশটি অশ্বে টানে চাঁদের রথ। এই অশ্ব দশটি কুন্দধবল। চাঁদের রূপটিও স্নিগ্ধ! কিন্তু সূর্যদেব বিরাজ করেন উগ্ররূপে।

এমন একটি রূপবান পাত্রকে কে কবে হাতছাড়া করতে চেয়েছে? আপনি কী বলেন?

আমি যেন যুঁই ফুলের গন্ধ পেলাম মালার কথায়। চোখেতে হাসির মাধুরী ফুটিয়ে নীরবে ওর কথায় সায় দিলাম। মালাও চেয়েছিল আমার চোখে-চোখ রেখে, হাসলো খানিক।

বলে চললো মালা ঃ রাজা দক্ষ তাঁর সাতাশটি মেয়ের বিয়ে দিলেন চাঁদের সাথে। অতগুলো চারু-যৌবনা বউ পেলেন চাঁদ। কিন্তু, মেতে রইলেন দক্ষ রাজার রোহিণী কন্যাটিকে নিয়ে। রোহিণীকেই করলেন তাঁর পাটরাণী। অন্য বউদের—তাঁদের উচিত পাওনা....আদর সম্ভাষণটুকুও দিতেন না।

পিতা দক্ষের কাছে গিয়ে আপন-আপন মনোবেদনা জানালেন—কৃত্তিকা, আর্দ্রা, ভরণী, স্বাতী, চিত্রা, রেবতী, বিশাখা ইত্যাদি বাদ-বাকী মেয়েরা।

দক্ষ রাজা ডাকলেন তাঁর জামাই চাঁদকে। বলে দিলেন, আমার প্রতিটি মেয়ের সাথে তুমি সমান ব্যবহার কোরো।

—তা কী হয়? রোহিণীর মধ্যে যা পাচ্ছেন চাঁদ, তা যে অন্য বউরা কেউই দিতে পারছে না। শ্বশুরের আদেশ অনুযায়ী কী বাঁধা পড়া যায় প্রেমে? রোহিণী হয়ে রইলেন চাঁদ-লগ্না। চাঁদ হয়ে রইলেন রোহিণীতে বাঁধা।

—শ্বশুর দক্ষ রাজার অন্তরে ধীরে ধীরে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে লাগলো। একদিন ফেটে পড়লেন ক্রোধে। অভিশাপ দিলেন, যক্ষ্মা রোগ তোমায় আক্রমণ করবে।

—হয়েছিলও তাই। যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করলো চাঁদকে।....চাঁদ দুর্বল ও অসুস্থ ক্ষীণ শরীরটিকে নিয়ে কোনোরকমে প্রভাস তীর্থে এসে স্নান করলেন। রোগ মুক্ত হলেন—চাঁদ।

আমায় অধীর করে তুলেছিল, এই চাঁদ-কথা। মালাকে থামতে দেখেই বলে বসলাম: এ টুকুতেই কী চাঁদ-কাহিনী শেষ?

: খুব মজে গেছেন দেখছি। শুনুন আরও—

—কালিকা পুরাণ অন্য ভাবে বলে—চাঁদের কথা। বলে, সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হতে পারেন নি চাঁদ। চাঁদের স্ত্রীরা পিতা দক্ষকে বললেন, আপনি অভিশাপ ফিরিয়ে নিন।

—কন্যাদের কথা শুনেছিলেন রাজা দক্ষ। বললেন, মাসের মধ্যে পনেরো দিন যক্ষ্মারোগে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকবে তোমাদের স্বামী চাঁদ। আবার বাকী পনেরো দিন-এ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে।

—তাই, মাসের মধ্যে আমরা কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ—এই পক্ষ দুটো পাই। চাঁদের প্রণয় ইচ্ছাও ছিল ভীষণ প্রবল। নিজের সাতাশটি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে নিয়ে পালিয়েছিলেন।

কথাটুকু শেষ করেই আমার কোলে হেলে পড়লে মালা। বললে: সংযম ভাঙ্গবে না তো আবার? পরক্ষণেই শাসন করলে: 'অটল' থাকুন।

আমার চিন্তাতে ও চেতনাতে এক মহান অভিজ্ঞতার সঞ্চার সম্ভব হলো। এই সঞ্চার—আমার মত মর্তবাসীর কাছে এক বিরাট অনুভবের অভ্যুদয়।....আমি সাধকের উপলব্ধি ও তাত্ত্বিক দার্শনিকের বিশ্বাসের মধ্যে এসে পড়লাম।....মালা, মনোমালা আমায় 'ভুলে' দিলে একবার।

মালার কুটীরে এসে বসলাম।

আমার ইচ্ছা ছিল আরও অনেক সময় নিয়ে বসে থাকি....জ্যোছনা আলোয়।

: আপনার ক্লান্তি আসছে না তো?

—না, বললাম।

মালা বললে: অপেক্ষা করুন একটু। প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিই। আরও চাঁদ-কথা শোনাবো।

আমি কোনো একটিও কথা বললাম না। আমার অন্তর-সত্তায় খানিক পূর্বের অনুভূতিটি তখনও যেন অনেকটুকুই সজাগ করে রেখেছে আমায়। তার কারণটুকুও—এই মালাই তো!.... মালা, কখনও আমার বসে থাকার স্থানটি হতে অল্প একটু দূরে চলে যাচ্ছে, আবার কাছে চলে আসছে কিছুটা।....বুঝে নিলাম, কোনো-কিছু খুঁজছে যেন মালা।

কিছু বলতে যাবো, সে ক্ষণেই মালা ফিরলে আমার দিকে। ....ঘরে তো আলো নেই। তখনও প্রদীপটি হয়ে ওঠেনি 'জীবন্ত'। তবুও মালা যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠলো আমার কাছে। শুনলাম: আজ সকালে একটি বেলপাতা পেয়েছি। ত্রিপত্র বেলপাতাই তো সচরাচর আমরা দেখে থাকি। এটি ছিল পঞ্চ-পত্র। শ্বেত-চন্দন

রক্ত-চন্দন লাগিয়ে ভূর্জ-পত্রে জড়িয়ে রেখেছিলাম। সেটাই খুঁজছি। কোথায় যে রেখেছি........

ঃ আগামী প্রভাতে দেখো—

—তাই হবে।

প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিয়ে আমার দিকে মুখ রেখে মালা বসলে। আমার—মন—লোভের মধ্যে পড়েই আবার উঠে এলো। এবারে তো মালা অশোক-কুঞ্জের মত আমার স্পর্শের মধ্যে এসে বসলে না!

প্রদীপ-শিখা আমায় ইঙ্গিত দিলে বুঝি! মালার সম্পূর্ণ শরীরই দেখতে পেলাম। শুধু দেখতে পেলাম না মালার চোখ-দুটো। আঁখি-পল্লবে ঢাকা ছিল তারা।

ঐ ভাবেই মালা নেমে এলো—তার উচ্চারণে—

অন্য বৃত্তান্তটি এই ঃ দেবতারা ও অসুররা যখন ব্যস্ত ছিলেন সমুদ্র মন্থনে, সে সময়—লক্ষ্মী, পারিজাত ও অমৃতের সঙ্গে চাঁদও উঠে এসেছিলেন সমুদ্র থেকেই। সাথে সাথেই তিনি স্বীকৃতি পেলেন যে, তিনিও একজন দেবতা। দেবতারা যখন অমৃত গ্রহণের জন্যে এক সারিতে এসে বসেছেন, দৈত্য রাহুও দেবতার ছদ্মবেশে ঢুকে পড়লে তখনই। চাঁদ তাঁর আপন অত্যুজ্জ্বল 'সব-দেখা' দীপ্তিতে রাহুর চাতুরীটি বুঝে নিলেন ও বিষ্ণুকে বলে দিলেন চুপি-চুপি। রাহুর গলা পর্যন্ত অমৃত তখনও নামেনি, সুদর্শন-চক্র ব্যবহার করে—বিষ্ণু রাহুর মুণ্ডটি কেটে দিলেন। রাহুর সেই ছিন্ন মুণ্ডটি ছুটে এলো চাঁদকে গ্রাস করতে।....রাহু মাঝে মাঝে চাঁদকে গিলে ফেলেন। চাঁদও বেরিয়ে আসেন রাহুর গলা দিয়ে।....চন্দ্র গ্রহণের রহস্যটুকু এই।

মালার—মনের নত-জানু ভাবটি বড় ভাল লাগছিল আমার। তার নিবেদিত অতল-স্পর্শী প্রাণাবেগটুকু অতি প্রশান্ত-স্তরে নেমে গিয়ে আমাকেও শান্ত ভাবে বসিয়ে রেখেছিল। আমিও আমার মনের সাথে

গিতালি পাতিয়ে চুম্বনে চুম্বনে একান্ত আপনার করে নিতে চলেছি····আপনাকে।····আমি যেন কী এক 'হতে' চলেছি তখন।····মালা কাছেই আছে। আমিও তো আছি মালার কাছেই।····আমার যুবক মনের অভিসন্ধিটুকুও তো আর লুকোচুরী খেলতে চাইছে না। তারা যেন ভুলে গেছে তাদের....ইতরতা।

মালা—বুঝেছিল কী বোঝেনি, আমি তা বুঝে উঠতে পারলাম না।····এই যে, এইটুকু সময়কে নিয়ে আমি আমার মনো-উপলব্ধির কোঠাতে বসে ছিলাম : মালা তো নীরবই ছিল।

আবার মালা ফিরে এলো চাঁদ-কথাতে : দৈত্যদের অতখানি ক্ষতি করেও, অবস্থা-বিপর্যয়ে চাঁদকে আশ্রয়-সাহায্য চাইতে হয়েছিল দৈত্যদের কাছেই।····দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারার রূপে কামমোহিত হয়ে তো হরণ করে বসলেন। তখন ছুটে আসতে হলো দৈত্যদের কাছে। এ ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না তো।····সমস্ত দেববৃন্দ যে চাঁদের বিরুদ্ধে ধেয়ে এসেছেন। দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে উঠলো। উভয় পক্ষকে নিবৃত্ত করতে এলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মার কথায় চাঁদ ফিরিয়ে দিলেন তারা-কে। কিন্তু, তারা তো তখন গর্ভবতী। চাঁদের সন্তান তাঁর গর্ভে।····সময়ে পুত্র-সন্তান জন্মালো। সন্তানের নাম রাখা হলো বুধ। বৈবস্বত মুনির মেয়ে - ইলাকে বিয়ে করেছিলেন বুধ। এঁদেরই ছেলের নাম পুরুরবা। এই পুরুরবাকে দেখেই স্বর্গের নৃত্য সভায় উর্বশীর তাল ভঙ্গ হয়েছিল। ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ-বলরামের জন্মও তো এই চাঁদের বংশে।

—পত্নী হরণের ক্রোধে বৃহস্পতিও অভিশাপ দিয়েছিলেন চাঁদকে, তুমি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হও। প্রবাদ আছে, ছাগলের অথবা খরগোসের গায়ের গন্ধ শুঁকলে নাকি উপকার হয় যক্ষ্মারোগের। খরগোস একটি কোলে নিয়ে— তাই চাঁদ হয়েছেন শশাঙ্ক।

আমি যেন ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছিলাম।

মালার কথা শেষ হতেই বলে বসলাম : দুই বৃত্তান্তেই তো চাঁদকে প্রেমাতুর ও যক্ষ্মারোগী বলে—বলে দিচ্ছে। এ কারণেই কী প্রেমিক-প্রেমিকার চাঁদের আলো........

: অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছেন কেন ?

মালার কথায় আমি লজ্জায় নেতিয়ে পড়লাম ....রূপজ বাসনা এতো তাড়না কেন করে আমায় (?) এ-কী, পুরুষ ভাবটি আমার মধ্যে প্রবল বলেই (?) শুনেছি—'পুরুষ ভাবটি' নিয়ে সাধনায় সিদ্ধি সম্ভব নয় কোনকালে। কিন্তু....আমি তো পুরুষ হয়েই জন্মেছি। এ—ভাবনার রূপান্তর........

: আপনি ব্যথা পেলেন, না ?

মালার এ কথাটিতেও মরমে মরে গেলাম। উত্তর দেবার মত কিছু ছিল না আমার। খুঁজেও পাচ্ছিলাম না কিছু। আমি তো তখন....আনন্দ ও বেদনা—এই দু'টোকে জড়িয়ে ধরে আমার অন্তরের সাথে পরিচিত হতে চলেছি বারবার। কখনো আনন্দ আসছে উপচে ; আবার কখনও আসছে বেদনা—আনন্দ বাধ্য হচ্ছে একটু দূরে গিয়ে আড়াল হয়ে থাকতে। আমি যেন মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি—দুই বস্তুর। যে যখন পারছে—তার সুবিধা মত আমায়........

: আপনি আর একটু নিকট হোন—!

যেন কোন একটি যন্ত্র আমায় চালিয়ে দিলে। আমি মালার নিকট হলাম।

: আপনি দিন ভালবাসেন, না রাত্রি ?

আবার গুলিয়ে যেতে হলো। কোনটা বলি (?), ভাবতে আরম্ভ করেছি মাত্র ; 'পুঁথি পড়বো ?'—শুনতে পেয়েই আমার জিহ্বা নড়ে নড়ে বলে উঠলো : বেশ হয় কিন্তু তা হলে—

ঃ আপনি 'পালাতে' পেয়ে বাঁচলেন। আপনি নিজের থেকেই অযথা বিপদে পড়েন। খুব বেশী করে সব কিছুতেই ভাবেন কি-না তাই।

কথায়, এখানটায় এসে মনোযোগ দিলে প্রদীপ। একটু উসকিয়ে তীব্র করে দিলে প্রদীপ-আলো।

এই যে 'অবসরটুকু' দিলে মালা ওতে আমার প্রাণ....অনেকখানি পরমায়ু কুড়িয়ে নিলে তখনই।....আমি মনোবীণায় বেজে উঠতে লাগলাম।

প্রদীপে হাত পড়তেই আমার বোঝা হয়ে গিয়েছিল, পুঁথিতে —আসবে মালা।....নিজের প্রতি নিজেরই করুণা বোধ হতে লাগলো। আশ্রমে এসেছি,—কিন্তু মনটি আমার বহু সময়েই পার্থিব ঐশ্বর্যের দুয়ারে করাঘাত করে বসে।....আমি যেন কেমন হয়ে যাই তখন। আমার এই চঞ্চলতার প্রতিবিম্ব কিন্তু আবার....'অন্য-একুটে' নাড়া খেয়েই—

ঃ আমি পুঁথিতে চললাম, বলে, কণ্ঠস্বরে পুঁথির অক্ষরগুলো এক-এক করে গেঁথে যেতে লাগলে।—

তৎক্ষণাতই আমি আমার মনকে 'আভরণ-শূন্য' করার চেষ্টা করলাম। পারলাম কিনা সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখলাম না। চলে এলাম বাতাসের গতি নিয়ে পুঁথির কথায়—

"শ্রীমান তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদ্ভুত যাহার চরিত॥
পূর্বে তেঁহ আছিলা বাল্মীকি মুনিবর।
লোকের নিস্তার হেতু কৈল অবতার॥"

পূর্ণ ব্রহ্মের লীলা-ইচ্ছা জাগলো। মর্তের পৃথিবীতে এলেন বাল্মীকি মুনি—

"লৌকিক লীলাতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
জন্মিলেন মহাশয় লোক ব্যবহারে॥

কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালী কৈল।
স্ত্রীর বশীভূত বিপ্র একান্ত হইল ।।"

মর্তের মানুষরা ভাবতে লাগলো, এ-কোন্ পুরুষ এসে জন্ম নিলে। এমন....স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ তো কেউ কোনোদিন দেখেনি। যত্রতত্র কেবলই স্ত্রীর প্রশংসা-গাথা নিয়ে কথা তোলে, আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দেয়। এক পল সময়ও কাছ-ছাড়া করতে চায় না স্ত্রীকে। এমন কি....স্ত্রীর বাপের বাড়ী হতে মানুষ এসেও ফিরে যায়, স্ত্রীকে পাঠাতে চায় না সেখানে। এ রকম এক-আধবার নয়, বহুবারই মানুষ এসেছে—ফিরে গেছে, তুলসীদাস পাঠায় নি তার বৌকে। ....এ বড় লজ্জার কথা গো! চারিদিকেই শুধু এ কলরব যে—!

একবার পাঠাতে হলো স্ত্রীকে—

"অনেক কষ্টেতে যদি পাঠাইয়া দিলা
স্ত্রীর বিচ্ছেদে ঘরে রহিতে নারিলা ।।
কান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা।
স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিতা হইলা ।।"

—হারে মূঢ়! তোমার মত হতভাগা নির্লজ্জ বর্বর পুরুষ মানুষ কি আর জন্ম নেবার স্থান পেল না? শেষে—এসে আমার পতি হয়ে বসলে—

"লোকে উপহাস করে ঘৃণা নাহি হয়।
গলায় রসুড়ি দিয়া মরিতে জুয়ায় ।।
এত আর্ত্তি তব যদি ঈশ্বরে হইত।
না জানি ভাগ্যের ফল তবে কি না হইত ।।"

স্ত্রীর কাছে বহু শোনা হলো। আর নয়। তুলসীদাস ভেবে নিয়েছে কিছু—

"তৎক্ষণে হইল মনে বিবেক উদয়।
অমনি ফিরিয়া আইলা ঘরেও না যায় ।।

সর্বত্যাগ করি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ।
আশ্রয় করিয়া লইল একান্ত শরণ ॥"

তখনই জগত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ একটি নিয়ে বসে গেলেন পূজা-ধ্যানে।

ভক্তকে কতো ভাবে যে ঠাকুর টেনে নেন, তা সব মানুষেরই ধারণার অতীত। এই পবিত্র ভূমে কত শত ভক্তকে নিয়ে....তিনি নানা ছলে লীলা করে গেছেন, কে তা বলতে পারে! কিছু কিছু ভক্তজনের কথা লেখা হয়েছে....সত্য। কিন্তু অধিকাংশ ভক্তই লোক-চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে মর্তের পরমায়ুটুকু নিঃশেষ করে চলে গেছেন অমৃত-ধামে।

—তুলসী দাসের বেলাতে—

"বিগ্রহ প্রকাশি কৈলা সেবা চমৎকার।
অদভূত হইল তবে প্রেমের বিকার ॥
অল্পকালে রামচন্দ্রের অনুকম্পা হইল।
অনেক সংসার সাধু পবিত্র করিল ॥"

মালা তো নত-আননে পুঁথির পাতাতেই রয়েছে।

আমি কিন্তু উঠে এলাম এক 'নব-জাগরণে'।....মালার অনুশাসন যে আমার জীবনে পুষ্প-পরাগ এনে দিতে চলেছে। মালার সাথে একত্রে আশ্রম-জীবন কাটিয়ে চলেছি—এর ফাঁকে ফাঁকে মালা....যেন 'কোন্-এক' জগতের নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

আচার্যদেব....তবে কী—আমার মনোমধ্যে 'জাগরণ' ঘটাতেই, আমায় রেখে গেলেন এ ভাবে?

মালা এখন একাধারে আশ্রম-সাথী। একাধারে....

: ভাববার সময় পাবেন অনেক—

মালার কথা কাণে এলো। এক লহমার মধ্যে উড়ন্ত-পাখী হয়ে উড়ে গেল আমার ভাবনাগুলো।

মুখ তুলতেই দেখতে পেলাম, মালা চেয়ে আছে আমার দিকেই। ওর চোখের চাহনির-লাবণ্যে আমি আটকা পড়ে গেলাম।

বললাম ঃ তুমি তো পুঁথিতে ছিলে—

—হাঁ, ছিলাম তো তাই।—মালা হাল্কা হয়ে কথা বললে। কিন্তু আপনি তো থাকতে দিলেন না।

আমার অসুবিধে হলো না বুঝতে। বুঝে গেলাম, আমার ভাবনার তরঙ্গ-গুলো—এই এখনকার পরিবেশটির আকাশে কাঁপন তুলেছিল।....সে কাঁপন বাতাসের সাথে মিশে যায়।....ঐ বাতাসই মালার মনটিতে আঘাত হানে! মালার থেমে-যাওয়ার কারণটুকু এ-ই।

মালাকে তো গুরুজন বলে ভাবতে পারি না। তাই ক্ষমাও চাইতে পারলাম না। অপরাধীর-স্বরে কথাও বলতে পারলাম না। বললাম শুধু ঃ পুঁথিতে চলো।- এক করুণার ভিক্ষা বেজে উঠলো আমার স্বরে।

আমারই আদেশের অপেক্ষায় ছিল যেন মালা। এমনি একটি ভাবকে আশ্রয় করে ফিরে গেল পুঁথিতে—

"কাশীর অন্যত্র সাধু আর কোন স্থানে।
কোনো প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে॥
এক বৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম করিলা।
পাক্ করি খাইবারে উদ্যোগ করিলা॥

সেই বৃক্ষে এক ভূত থাকতেন।—তার যাতনা-শরীর নিয়ে দিবানিশি দুঃখ পেয়ে চলেছে সে—

"সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ-ধৌত কৈলা।
পাদ-ধৌত ছিটা গিয়া বৃক্ষেতে লাগিলা॥"

তৎক্ষণাত নিস্তার পেয়ে গেল সেই ভূত। দিব্য-দেহ ধারণ করলে। শ্রীবৈকুণ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে—

"দেখিয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে।
কে তুমি স্বরূপ কহ কৃপা করি মোরে॥"

: আমি ভূত যোনিতে ছিলাম। তোমার চরণ-অমৃত দিয়ে আমায় উদ্ধার করলে তুমি।

তুলসীদাস ওঁর এই পরিণতির বৃত্তান্ত সব শুনলেন।—তুমি তা হলে বৈকুণ্ঠের পারিষদ ছিলে? তোমার কাছে যে আমার একটি প্রার্থনা আছে—

"শ্রীরামদর্শন আমি কি উপায়ে পাই।
কৃপা করি কহ মোরে নিবেদন এই।"

উনি বললেন: তোমার 'আধার' তো রূপান্তরিত হয়েছে। তুমিই সাধু হওয়ার যোগ্য পাত্র। তোমার আমি আর নতুন কথা কী বলতে পারি। তথাপি যুক্তি একটি দিচ্ছি তোমায়—

"শ্রীল হনুমান রামচন্দ্র-প্রিয়তম।
তাঁহার কৃপাতে অতি পাইতে সুগম॥"

তুলসী দাস বললেন: উত্তম বুদ্ধিটি তো দিলে। কিন্তু 'তাঁর লাগ পাবো কোথা'?

: সত্যিই তো! তবে শুনে নাও—

"এই গ্রামে অমুক যে ব্রাহ্মণ গৃহেতে।
তিনি আইসেন রামায়ণ শ্রবণেতে॥
মনুষ্য বেশেতে অবধূত বেশধারী।
অমুক দিকেতে বৈসেন ছন্নরূপ করি॥
পাঠ-অন্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় করি।
ধরিয়া কহিবে মোরে দেখাও শ্রীহরি॥"

—এইটুকু পরিশ্রমই কেবল করতে হবে তোমায়। তোমার

বাকী যা সব—শ্রীল হনূমান বুঝে নেবেন। রঘুমণিও দেখতে পাবে তুমি—

"এত কহি তেঁই পরব্যোম চলি গেলা।
রামায়ণ যথা ইহ তথায় চলিলা ॥"

তুলসী দাস, এসে তো গেলেন—

"দেখেন সহস্রলোক চারিভিতে হয়।
অবধৌত বেশ কোন জন নিরখয় ॥"

ঐ তো দেখতে পাওয়া যায়। তৎগত চিত্ত হয়ে রামায়ণ শ্রবণ করছেন। মাঝে-মধ্যে ভাবে বিভোর হয়ে শূন্যে চেয়ে বসছেন। আবার—'ক্ষণে-ক্ষণে আনন্দে হাসয় মুচকিয়া।'

"পাঠ অন্তে লোক সব উঠিয়া চলিলা।
অমনি যে হনূমান গমন করিলা ॥"

বেজে উঠলো তুলসী দাসের মন-মন্দিরা—

"তুলসী সম্মুখে গিয়া।অষ্টাঙ্গ হইয়া।
পড়িলা প্রণাম করি চরণে ধরিয়া ॥"

মৃদু হাসলেন, শ্রীল হনূমান। আলিঙ্গনে বাঁধলেন তুলসী দাসকে। তুলসীদাস বললেন—

"তব প্রিয় রামচন্দ্র আমারে দেখাও।
অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও ॥"

তুলসীদাসের মন 'ঢালু জমিতে' নেমে এসেছে। শ্রীল হনূমান প্রসন্ন হয়ে বর দিলেন : "অচিরাতে দেখা দিবে হরি"।

পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে শ্রীল হনূমানের স্তুতি করলেন তুলসী দাস।
—"তেঁহ চলি গেলা, ইঁহ নিজ স্থানে আইলা।"

"সহজেই রামচ· ·াহে কৃপাবান।
তবে যে এতেক চেষ্টা উৎকণ্ঠা কারণ ॥"

থামলো মালা। বললে : মহাজনরা তো বলেন, চোখের পাতা পড়তে যতটুকু দেরী হয়—তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে—দেখা দেয়....'কৃপা'।

আমি বললাম : আরও একটু সহজ করে বলো তুমি।

মালা কিন্তু আমার এই মূঢ়তায় বিরক্ত বোধ করলে না। আমি স্বচ্ছ হয়ে জেনে গেলাম, আমার কথা আনন্দ দিয়েছে মালাকে।

মালা বললে : আপনি এমন....শিশুর মত কথা বলেন।

—হাতের কাছেই শিশি ছিল। প্রদীপে বেশ খানিকটা তেল ঢেলে দিলে। সল্‌তেটাও দিলে আরও একটু উসকিয়ে।

এতক্ষণ আমরা মৃদু-মৃদু আলোর বুকে ছিলাম। এবারে গেলাম উজ্জ্বলতর আলোর কোলে।

: কৃপা তো আছেই, ধরতে হয়। 'কার্য-কারণ'—রয়েছে না?

আমি বুঝলাম কি বুঝলাম না—সেদিকে লক্ষ্য না দিয়েই পুঁথির পাতায় বসে গেল—

—গোহত্যার কারণ হয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণ। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নানা তীর্থ ভ্রমণ করলেন। শেষে একদিন তীর্থের টানে চলে এলেন বারাণসীধামে।....মুখে নিয়ত জপ করে চলেন রামনাম মহামন্ত্র।

তুলসীদাসের স্থানে এসে প্রণাম জানালেন। নিজের পাপ-কর্মের কথাগুলোও সব বললেন তাঁকে।—এর জন্যেই তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছি।—আমি। .

একটু যেন উত্তেজিতই হয়ে পড়লেন তুলসীদাস। রামনাম নিয়ত জপ করে চলেছো তুমি,—তবুও প্রায়শ্চিত্তের জন্যে ছুটে বেড়িয়েছ তীর্থে-তীর্থে! হাঁ রে দুষ্ট কুমতি, এটা কী জানো না তুমি—

"আনুসঙ্গ এক নামে যত পাপ হয়।
কোটি কল্পে পাপী তাহা করিতে নারয়।।

শ্রীমন্নাম উচ্চারণ উপক্রম হইতে।
পাপ যায় শুভ হয় সর্ব তৎক্ষণাতে ।।"

—শাস্ত্রীয় প্রমাণও শুনতে চাও—?

শোনো তবে :

"অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণীরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ।।"

—সূর্যদেব যেই উঠলেন, অমনি বসুমতীর নিখিল অন্ধকার বিদূরিত হয়; তদ্রূপ এই ভবসাগরের তরণী স্বরূপ····জগন্মঙ্গলকারী শ্রীহরির নাম যে ক্ষণে উচ্চারিত হলো, সমুদয় পাপ রাশি ধ্বংস করে—নাম সবার উপরে বিরাজ করেন।

ব্রাহ্মণকে আরও····অনেক—হিত-কথা বললেন। কিন্তু তাঁর, উত্তেজিত ভাবটি রয়েই গেল।

তিনি বলে চললেন :

"হেন পরাৎপর যে তারকব্রহ্ম নাম।
তাহে অল্প বুদ্ধি করি করে অন্য কাম।
অন্য ধর্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে।
নাম অঙ্গ যজ্ঞ অঙ্গী করিয়া আচারে ।।
সেই অপরাধে তার নিস্তার না হয়।
নানা যোনি নরকাদি ভ্রমিয়া বেড়ায় ।।
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ-ভক্তি অধিকারী নহে।
তমোময় হয় দম্ভ অহঙ্কার সহে ।।"

—অতএব ওহে ব্রাহ্মণ! যা বলি তা শোনো—

"যদি আত্যন্তিক নিজ হিত চেষ্টা কর।
সর্ব ধর্ম ত্যজি তবে রামচন্দ্র ভজ ।।"

—অন্য পুণ্য-কর্মের অভিলাষ যদি এখনও থেকে থাকে কোনো,

সে সমুদয় পরিত্যাগ কর তুমি। তোমায় আর প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে না।....ঐ এক শ্রীরামচন্দ্র ভজনেই—প্রেমানন্দ মহোৎসব অনায়াসে পাবে। ইহার অধিক লাভ আর কোথা পাবে।"

শ্রদ্ধাভক্তিতে নম্র-নত হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন : মহাশয়! আমার প্রতি কৃপা করে....যখন এত হিত-কথা শোনালেন, তখন আরও কিছু নামের মহিমাও কীর্তন করুন। কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করুক আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত নাম-মহিমা। আমার চিন্তাধারার আশু পরিবর্তন ঘটুক। আমার রক্তে অনুরূপ....চঞ্চলতা উপস্থিত হোক। আমার মেদ মজ্জাও ঐ নাম মহিমা তরঙ্গে আঘাত পাক। আমার জন্ম-জীবন পূর্ণ সফলতার পথ নিক। আপনার প্রসাদে....আমার ভক্তি-জ্ঞান-বল প্রসারিত হোক। বিস্তার লাভ করুক।

"তবে সাধু প্রেমাবেশে প্রশংসা করিয়া।
নামের মহিমা কিছু কহে হৃষ্ট হইয়া।।"

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।"

—শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণ-চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ; নাম ও নামী অভিন্ন।

"শ্রীমন্নামচিন্তামণি সর্বফলদাতা।
পূর্ণ চৈতন্যরসে কৃষ্ণে অভিন্নাত্মা।।
নিত্য মুক্ত নির্গুণ পরাৎপর বিভু।
নাম নামী অভেদ ত্রিজগতে প্রভু।।"

ব্রাহ্মণকে আবার বললেন—

"মধু মধুরমতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপ।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥"

হে ভৃগুবর ! কৃষ্ণনামামৃত অতি মধুর এবং সর্বকল্যাণের আলয় ; সকল নিগম-সমূহের পরম উপাদেয় ফল এবং চিদানন্দস্বরূপ ; সুতরাং এই মধুর কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায়....একটিবার মাত্রও ব্যক্তাব্যক্তরূপে উচ্চারিত হলে—জনগণের ত্রাণ করে থাকেন।

আমি—অবাক-আশ্চর্য হতে চলেছি....; পথ হতে ফেরালে মালা।

: আপনার "সন্দেহ-ভঞ্জন" শুনে নিন—

নাম ও নামী অভিন্ন। জীবের প্রতি করুণায় আর্দ্র হয়ে এই মায়াময় প্রপঞ্চে সময়-সময় ঐ ভগবৎস্বরূপ অবতীর্ণ হন। এই ভগবৎস্বরূপের অবতাররা একই সময়ে—এই একই ব্রহ্মাণ্ডে 'আসেন' না। কোন বিশেষ যুগে এঁরা আসেন—নিত্য সিদ্ধ ভক্তজনের বিনোদনের জন্যে।....এই 'আসাটা' এঁনাদের লীলার্থে ও ইচ্ছাক্রমে।....যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি আর কি !

—এই সময়ে সাথে-সাথে এই অবতীর্ণ-অবতারদের নিয়ে আবার বেশ একটি মজার জগতও গড়ে ওঠে—ঠিক পাশাপাশি।........ শ্রীগীতাতেই নবম অধ্যায়ে পাবেন—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং"—। বিশেষ সৌভাগ্যবান মানুষরা ছাড়া—অপরে প্রত্যেকেই "যোগমায়াসমাবৃত" হয়ে থাকেন।....আর, এ কারণেই —ঐ অবতীর্ণ অবতারের প্রকৃত স্বরূপটি তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁদের মতিভ্রম ঘটে।....

আর একটি কথা : আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজি, রামনাম উচ্চারণ করবো কেন ? এ-ও একটি যথার্থ প্রশ্ন কিন্তু ! না, আপনি কৃষ্ণই ভজনা করুন ; রামনাম মুখে আনতে হবে না—এমন কথাও কেউ বলবে না আপনাকে—কোনদিনই। তবে জানেন ? ঐ-যে কোনো একটি

'নামে' নিষ্ঠা থাকাটাই মূল-কথা। ধীরে-ধীরে দিনে-দিনে আপনার চিন্তার জগত যতো সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে থাকবে—আপনার কাছেই প্রতিভাত হবে—কৃষ্ণ-রাম অভিন্ন।····সে 'প্রসারী বোধে' প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, গণ্ডগোল একটু থাকবেই। থাকেও তা.

মালা বেশ ঘেমে উঠেছে দেখতে পেলাম।····এই পরিশ্রমে কিন্তু আরও সুন্দর আরও মধুর মনোলোভা হয়ে উঠেছে মালা।

মালা আবার মনোনিবেশ করলে পুঁথি পাঠে—

"এক স্ত্রী স্বামী সহ সতী হইতে যায়।
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করয়।।"

—এই স্ত্রী, ঐ-ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। দেহকে প্রাণান্তিক দণ্ড দেওয়াই ওর কাছে ধর্ম। শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ ধর্ম পালন।···· ওতে আর কী হয়! কিছুকাল 'স্বর্গভোগই' হয় কেবল।— "সম্মুখে দারুণ কাল সংসার অনল"—স্ত্রীটিকে এ বিষয়ে একটু 'ব্যবহার' করা উচিত।

"দয়াল হৃদয় সাধু এতেক চিন্তিয়া।
স্ত্রীর নিকটে গেলা করুণা করিয়া।।
মহান্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী।
প্রণাম করিলা অতি ভক্তিভাব করি।।"

বললেন তুলসীদাস :

"শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে যে পরলোকে গতি কি পাইবে।।"

স্ত্রীটি বললে :

"—স্বামী সঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ মহেন্দ্রকাল বিষয় ভূঞ্জিব।।"

তুলসীদাস বললেন ঃ "—তাহার অন্তেতে কী হইবে ?"
বললে স্ত্রীটি ঃ "—কর্মবশে যে হয় হইবে।"

তুলসীদাস বললেন ঃ

"কর্মক্ষয় ইথে না হৈল।
দারুণ সংসার জ্বালা তবে ত না গেল॥"

তুলসীদাসের এই কথায়, স্ত্রীটির মধ্যে জিজ্ঞাসা এলো একটি—

"জন্ম-মৃত্যু-মায়া-মোহ কি করিলে যায়।"

'মহাপ্রাণ' স্পর্শ করে, নেমে এলেন তুলসীদাস। বললেন—

"রামনাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ধন্য সেই ত্রৈলোক্য বিজয়॥
দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে।"

—তুলসীদাসের শ্রীমুখ-নির্গত বাণী,—স্ত্রীটির অজ্ঞানতা নাশ করে দিলে। তুলসীদাসের চরণে প্রণাম জানালে—সে।—"কৃপা করি কহ যাতে মোর হিত হয়।"

—"শ্রীমান তুলসীদাস নিজ ভক্তি বলে।
শক্তি সঞ্চার কৈলা ভাসে প্রেমজলে॥
কৃপা করি স্বামীদেহ বাঁচাইয়া দিলা।
তাহারেও রামচন্দ্র-চরণে সঁপিলা॥"

আমি পুঁথির কথাও শুনছিলাম, মালাকেও দেখছিলাম।....
পরিশ্রমী মালাকে দেখতে যে ভাল লেগেছিল বড্ড।

পুঁথি হয়তো তখনও শেষ হয়নি; তবুও আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। চাইলাম বিশ্রাম নিক মালা।

বললাম ঃ একটি কথা—

—কী ?... প্রশ্ন করে মালা চেয়ে রইলো আমার দিকে।

জ্যোছনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল মালা। সম্পূর্ণ পোষাক

শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরই কুটীরের দক্ষিণ দিককার উঠোনে। সময় তখন—প্রথম যামের যৌবনকাল।

আমি ছিলাম—আমার কুটীরে! জানালার দিকে মুখ করে বসে। সামনে আমার,—প্রদীপ—তার আলো ছিটিয়ে রেখেছিল। মাঝে মাঝে ফিরে আসছিলাম প্রদীপের আলোয়, আবার চলে যাচ্ছিলাম জানালার ফাঁকগুলোর মধ্যে দিয়ে একেবারে বাইরে। সোজাসুজি যতদূর দৃষ্টি চলে, কোনরূপ বাধা না পেয়ে।

বার কয়েকই ঐ ভাবে মনো-ব্যায়াম করেছি।....ভীষণ লাবণ্য ভরা উজ্জ্বল মনুষ্যাকৃতি রেখা একটিতে মনের চাহনি থেমে গেল। প্রথমে বুঝতে পারলাম না, কী ও-টি? সামান্য সময় চোখ দুটোকে চোখের পাতায় ঢাকা দিয়ে রাখলাম। বিশ্রাম পেল চাহনি দুটো।

মালাই তো! মালাই তো দাঁড়িয়ে।

বিশ্রাম পেয়ে চাহনি দুটো সতেজ-সজীব হয়ে উঠেছে।....চাহনি দুটো ফিরতে চাইলে না।....মালাকে নিষ্পেষণ করে চললো।

মালা কী (?) এই আজ প্রথম না, অমন ভাবেই....

আমার স্মৃতি জানিয়ে দিলে: শরীরে কিছুই না রেখে—দেহটিকে নগ্ন রাখা অভ্যেস করতে হয়। সুযোগ হলে, ঘরের বাইরে এসে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে ছেড়ে দিতে হয় নিজেকে।

সেদিন, আমার কোন প্রশ্নের পূর্বেই বুঝিয়ে দিয়েছিল মালা: মনকে দেহাতীত করে নেওয়ার সাধনার মধ্যে—এ-ও একটি সাধন-ধারা। জন্ম হতেই তো দেহ-রক্ষার্থে পোষাক ব্যবহার করে এসেছি। ....কালে কালে হয় কি, ঐ পোষাক যে কেবল দেহটিকে সর্ব ঋতু হতে রক্ষা করে চলে—তা নয়; ঐ রক্ষা করার সাথে সাথে —মনের ওপর একটি প্রলেপ দিয়ে যায়, যার ফল হচ্ছে—নগ্ন

দেহ····সর্ব প্রথম বিদ্যুৎ-গতিতে····মনকে নিয়ে চলে—'ইন্দ্রিয় ভূমিতে' এবং ইন্দ্রিয় ভূমির প্রথম দ্বারী—'কামই' তখন, আক্রমণ করে সর্ব প্রথম।

মালা কী তবে, 'ঐ'-অভ্যাসে আছে নাকি ?

সত্যি ! আমার প্রবল পুরুষ-ভাবটি জ্বালাতন করে আমার সাথে····বার বার প্রতিজ্ঞা করছি—জানালা দিয়ে বাইরে যাবো না; কিন্তু তৎক্ষণাই কী এক অদৃশ্য-ইঙ্গিতের বাঁধনে বাঁধা পড়ছি যেন। আমায় অসম্ভব ভাবে প্রবল প্রতাপে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে—বাইরে।

ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করে হাঁটতে লাগলো মালা। ওর চলার তালে তালে····আমি,---ওর পায়ের—নূপুরের ধ্বনি শুনতে লাগলাম।····নূপুর তো ছিল না। ওর চলার ছন্দেই যে ছিল নূপুরের রিনি-ঝিনি।

ভেবেছিলাম ঘুমের বিছানায় আশ্রয় পাবো না। তা হয়নি কিন্তু! প্রচণ্ড ঘুম নিয়ে ঝর-ঝরে একটি স্বপ্নের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম।

ঃ আহারের প্রয়োজন—এই স্থূল শরীর পুষ্টির জন্যে ····নিদ্রার প্রয়োজন—নিত্য নানারূপ কর্ম করার ফলে শক্তি নষ্ট হতে থাকে, ---তাই আবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে।

—মৈথুনের প্রয়োজন ঃ শারীরিক একটি আনন্দ উপভোগের সাথে····দেহ-মনকে জীবন্ত রাখা ও অলক্ষ্যে সৃষ্টি-পিপাসাটিকেও সফলতার পথ দেওয়া।

আমি বললাম ঃ সব-কটিই তো আমাতে আছে। আমার উপায় ?

: তুমি এখনও যৌবনের প্রভাবের মধ্যে রয়েছো, ইন্দ্রিয়-সংস্কারটিও কিলবিল করে খেলা করে চলেছে। তা বলে চিন্তার কিছু দেখি না। বয়সটি তো এখনও বেশ কাঁচা।

বললাম : মালারও তো তাই। মালা কে•, অ•ক মুক্ত ?

: মালাতে—তোমাতে প্র•ভেদ আছে। মালা— দহ-মন ইন্দ্রিয়ের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-র মধ্যে থাকলেও ; 'আমি'-- ও-নয় ; দ্রষ্টার আসন থেকে এই বোধে আ•• চেষ্টা করে। তা •ড়া— মালা তো মেয়ে, নারী। নারীর সংয•ের মাত্রা একটু বেশী। পুরুষ-সান্নিধ্যে নারী তো 'চঞ্চল' হয় না প্রথমে। নারী যে '•ত্র'—চঞ্চল হলে লাভ কতোটুকু ?

বললাম : আমার কী হবে না ?

: হবে। 'পুরুষ'—এই সংস্কারটি তোমার মধ্যে প্রবল। এ কারণেই —সুন্দরী নারী দেখলেই ধাক্কা খাও।....আত্মা—পুরুষ বা স্ত্রী কোনটিই নয়।....তুমি কিছু কিছু যোগ অভ্যাস করছো বটে.... ধাপে ধাপে চলো।....যোগসিদ্ধির দ্বারাও—আত্মা যে কোনো লিঙ্গ-ধারী নয়, এ-টি বুঝবে না। স্বরূপ অনুভূতিতে যে দিন আসবে ....তখনকার কথা।

আমি—এবারে প্রশ্ন করলাম : তাহলে ?

: 'তাহলে'—বলে কিছু নেই। শরীর ও ইন্দ্রিয়ঘটিতক্রিয়াই তোমায় আছাড় দিচ্ছে।....পথ—তোমাকেই আবিষ্কার করে নিতে হবে।....আচার্য জীবনানন্দ আসছেন।....মালার মঙ্গল উদ্দেশ্যে— তিনি তোমায় রেখে যান আশ্রমে।....মালার সাহচর্যে...

ভয়ানক একটি দুঃখ-সমুদ্রে ফেলে দিয়ে স্বপ্ন পালালো।....

আমি জেগে গেলাম। সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডটি তখন থরথর করে কাঁপছে। 'মূলাধারে' একটি টান অনুভব করে চলেছি।

বেশ কিছু সময় নিয়ে পড়ে রইলাম বিছানায়। বার বার স্বপ্ন-কথা আসতে লাগলো আমার কাছে।....'মালার সাহচর্যে'— এরপর আর কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি? স্বপ্নই বা ভাঙ্গলো কেন? শেষটুকু কী? কিছুকাল মধ্যেই তাহলে আসছেন আচার্যদেব—

কিন্তু, স্বপ্নে তো কাউকেই দেখিনি। কেবল প্রশ্ন-উত্তর হচ্ছিলো। প্রশ্নকর্তা আমি। উত্তরদাতা—

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না।....আজও বেলা হয়ে গেল। পুষ্প-চয়নে মালাই এসে গেছে এতোক্ষণে। তবুও—সাত-তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে হলো।

.

মালাকে দেখেই আমার মনো-আকাশে ঝিলমিল ঝিলমিল করে অনেক গুলোই তারা ফুটে উঠলো।....যেন এই মাত্র শিশিরে স্নান করে এসে দাঁড়িয়েছে মালা। মাথার কেশ পিঠে-কাঁধে ছড়ানো।....এ কী উদ্বেলিত রূপ!

একটু এগিয়ে এসে নীল জবা দুটো ছিঁড়লে। সাজিতে রাখলো।

আমি ইচ্ছে করেই 'জোনাকী' হয়ে গেলাম।....কিছুক্ষণ চুপিসারে আড়ালে থাকি, আবার কিছুক্ষণ মনো-আলোয় দেখেনি মালাকে মুখ ঘুরিয়ে।....আমি সর্বদা সাবধান হতে থাকলাম....মালা যেন তার 'ঘোরেই' থাকে....আমায় দেখতে না পায়।

আরও একটু এগিয়ে দূর্বাবনে বসে পড়লে। দূর্বা তুলতে লাগলো।

মনে উদয় হলো: উচিত হচ্ছে না আমার।....গত রাতের স্বপ্ন-

কথা পীড়ন দিয়ে চলেছে যে : এ কারণে সুন্দরী নারী দেখলে ধাক্কা খাও—

যেন এইমাত্র এলাম—এমনই একটি মুহূর্ত সৃষ্টি করে····সর্ব-অঙ্গ প্রকাশ করিয়ে দিলাম-মালার সামনে। মনটিকে 'প্রকাশ' করাতে পারলাম কিনা····সে টুকু সময় পেলাম না—তাই 'পরীক্ষাতেও' বসতে পারলাম না—মনটিকে সাথী করে।

সময় পেলাম না, নয় : আমি ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছিলাম।

চলে এলাম মালার কাছে। মালার পিছনটাতে এসে····দাঁড়ালাম।

মালা তো দূর্বা তুলছিল।····আমায় কিন্তু, ইচ্ছে করেই তেমনভাবে দেখলে না।····টুপ করে সামনে দিয়ে মাথার উপর হাত রেখে—এক গুচ্ছ দূর্বা ছুঁড়ে দিলে।

আমি ধরে ফেললাম। দূর্বাগুলো।

: এই এলেন ?

মালার প্রশ্নে—আমি, এক প্রবল-আলোড়নের মধ্যে পড়ে গেলাম। তৎক্ষণাত।····মালা কিন্তু তখনও আমায় দেখলে না।

করি কী ? কী উত্তর দিই ?····অবশেষে, আমার সোহাগ ভরা মনে বুদ্ধি এলো একটি। মালার প্রশ্নের উত্তর দিলাম না কোনো।····

অতি শীঘ্র এগিয়ে গেলাম। পিছন হতেই মালার মাথায় রেখে দিলাম দূর্বা-গুচ্ছ।

: আশীর্বাদ করছেন ?

কথা বোধহয় তখনও শেষ হয়নি। নড়ে উঠলাম।····এ কী ? মালা যে তার হাত দু'টো দিয়ে আমার পা ছুঁয়ে দিলে।

: আজ যে জবা তুলেছো বেশী করে ?

আশ্রম মন্দিরের দিকে ফিরছিলাম আমরা। পাশাপাশি চলেছি দু'জনে। খানিকটা পথ····প্রশস্ত। গা লাগালাগি না হয়েও দু'জনে হাঁটা যায় বেশ।

আমাদের এই হেঁটে চলার প্রথমে····আমি তো রেখে-চলেছিলাম মালাকে—দক্ষিণে আমার। কয়েক পা অগ্রসরও হওয়া-গেছে ঐ-ভাবে। মালা কী যেন কথা একটি বললে শুনতে পেলাম না। আমার তো মনোযোগ ছিল না ঐ-দিকে।····দেখলাম, দেখতে পেলাম, মালা 'দিক্' পালটালো।····ঘুরে গিয়ে, আমাকেই রেখে চললো ওর দক্ষিণে।

আমি ছুঁই-ছুঁই 'শিহরণ' মেখে বসলাম।

মালা বললে : দেবী পূজো করবেন না ?

আমার চির-অভ্যাস হঠাৎ হাল্কা হয়ে পড়া। হাল্কা হলাম : রক্ত-মাংসের দেবী পেলে এখনই করি—

: তাই পাবেন—

ভুল শুনলাম না তো ? গত বহুদিন তো মালার সঙ্গ করে আসছি। মাঝে অর্চনা এসে রইলো ক'দিন। সে দিনগুলো কখনও হেঁয়ালী হয়ে, কখনও কুয়াশায় আধো-ঢাকা হয়ে, কখনও বা মসৃণ-পরিচ্ছন্ন আনন্দময় হয়ে—চলে গেছে। পার করে এসেছি সে দিনগুলো কতো না নানা রংয়ের হাসি-আনন্দের খেলনা গড়ে।

: রক্ত-মাংসের দেবী পেলে করবেন ? দেবীকে নিয়ে পূজোয় বসতে পারবেন তো ?

আমি—আচমকা····কঠিন একটি ধাতব-বস্তুতে পরিণত হয়ে পড়লাম।

মালা ইশারায় ডেকেছিল।

যতক্ষণ না তার পূজো শেষ হয়, আমি ছিলাম বাইরে। গত এতগুলো দিন—যেখানে থেকে এসেছি। ঐ মন্দিরের বারান্দায়। আশ্রম-বিগ্রহকে সামনে রেখে।

কী এক সোনালী-চম্পকে ডুবে গিয়েছিল আমার সত্তা। দেহ-মন-প্রাণ সব ক'টি এসে মিলিত হয়েছিল....একটি 'আধারে'।

ওসব তো শোনা ছিল কিছু কিছু বনমালীর কাছে। তবে বনমালী তো তার মনো-পাত্রের ওপরকার আবরণটুকুই একটুখানি সরিয়ে দিত. কেবল। অন্দর মহলে প্রবেশ করতে দিত না। বলতো—সবই সংস্কারে করায়. তা জান তো? তুমি এই যে 'যুগ্ম-সাধন' ধারা শুনতে পাচ্ছো, জানবে—তোমার জীবনেও ঐ যোগাযোগটি হয়েই আছে—

সেই বনমালীকে বারবার মনে পড়ছিল। কিন্তু, কী....আশ্চর্য? 'অমন-করে'—মালাকে সামনে রেখে....আমি তো অধীর হয়ে পড়িনি?

মালার নাভি-পদ্মে যখন নীল জবা একটি রেখে....'বীজ' উচ্চারণ করলাম—

মালা বাহু বাড়িয়ে দেয়। গন্ধ-বিলানো কামিনী ফুলের মালার মত মনোমালার দেহ-লতা আশ্রয় পায় আমায় বক্ষে।....মেরুদণ্ডের অতি নিম্ন হতে একেবারে শেষ-প্রান্তটি পর্যন্ত—'একটি বিদ্যুৎ রেখা দিয়েছিল'—আমারই মানস-চক্ষে। অতি অল্প একটু সামান্য ক্ষণেরর জন্য।

—তারপরেই তো বাঁধন কাটে মালা। আর না, ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইলো। সে ভবিষ্যৎটি....এসে সৃষ্টি করবেন—আচার্যদেব।

আমি কোন কথাই বলতে পারিনি কিন্তু।....মালা যে 'যন্ত্রী'

আমার, আমি কেবলই একটি 'যন্ত্র' মালার কাছে।....আচার্য-কন্যা মনোমালার কাছে।

একটু তফাতেই চলে গিয়েছিল। আবার তখনই নিবিড় সান্নিধ্যে এসে আমায় নিয়ে বসে পড়েছিল পাশাপাশি।

'নারী'র—প্রথম সেই অতীত ইতিহাসটুকুকে পরিবেশন করেছিল আমার সামনে :

—ধ্যানে নিমগ্ন আদি পিতা ব্রহ্মা। চিরদিনই অপ্সরারা যা করে এসেছে, সেদিনও তাদের 'ঐ' ইচ্ছা জাগলো।

—বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যটি নিয়ে—আরম্ভ করে দিলে নৃত্য-গীত আদি-পিতা ব্রহ্মার ধ্যানাসনটি ঘিরে, বৃত্তাকারে। অপ্সরাদের রাঙা-চরণ-ছন্দের উচ্চরোলে ও কণ্ঠের সুরের কাকলীতে নীরব-নির্জনতাটি সরে গেল। আত্মসমাহিত মনের সেই প্রদেশ হতে নামতে হলো ব্রহ্মাকে।....তিনি সন্তোষ হারিয়ে ফেললেন। একটি সিদ্ধান্ত ভেসে উঠলো তাঁর চিত্তে : নর্তকীদের শিক্ষা দিতে হবে তাদের এই অনাবশ্যক কৌতূহলের জন্যে।

—ধ্যানাসন ছেড়ে উঠলেন।. ইচ্ছামতো অনেকটা আমের আঠা ভরে নিলেন একটি সুদৃশ্য পাত্রে।....মনোমত স্থান একটি বেছে নিয়ে বসে পড়লেন ছবি আঁকতে, মাটিতেই।

—আঁকেন কী? মনো-অধরে কুমারী-কল্পনা এসে, যে ভাবে ছুঁতে চাইছে...সম্মতি দিয়ে চললেন—ওতেই।....সম্মতি দিয়ে যেতে যেতে ঐ ছবিটি রূপান্তরিত হলো মনোলোভা সৌন্দর্যের চাঞ্চল্য-হীন এক অপরূপাতে।

—এ কী? কী এঁকেছেন তিনি? তাঁরই মনের তলদেশে এমনই একটি সৃষ্টির প্রেরণা লুকিয়ে ছিল এতদিন?....বেশ, এবারে এর নামকরণ করা হোক।

—'উর্বশী'—রাখা হোল নাম। উর্বী পৃষ্ঠে এর জন্ম যে।—

—মনো-আনন্দে একটু হেসে পড়লেন বইকি! অপ্সরা নর্তকীদের

সাদর আহ্বান জানালেন।....বলতো তোমরা, সুন্দর না আমার আঁকা এই ছবিটি ?

—অপ্সরারা স্তব্ধ তখন। ছবির ঐ ভুবন-মোহিনী....উদ্বেলিত রূপের কাছে—ওদের রূপ তো একেবারেই ম্লান, 'চক্ষু-হীন'। এই দেহ-প্রতিমা....রূপে—ওদের কাছে শ্রেষ্ঠা। অপ্সরাদের চোখের মণি দ্যুতি হারালো। সীমাহীন লজ্জায় নত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে ওরা....কিন্তু, ক্ষণ-সময়ও চরণ দু'টো ধরে রাখতে পারলে না কেউই; রক্তিম আননে অধোবদনে স্থান ত্যাগ করলে। ওদের সুখ-নীড় ভাঙলো।

—অপ্সরারা তো চলে গেল।....ব্রহ্মা এবারে ফিরে তাকালেন আবার তাঁর সৃষ্টির দিকে। মমতা জাগলো।....ছবিটি সচল-জীবন্ত হয়ে উঠলো।....উঠে দাঁড়ালো উর্বী পৃষ্ঠ হতে।

—রক্ত মাংসের নিখুঁত সুন্দরী নারী—উর্বশী। হিন্দুশাস্ত্র মতে এই পার্থিব-পৃথিবীর প্রথম নারী-নায়িকা।

....কতো যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিলাম, তা আমারও হয়তো ধারণার ভূমিতে সঠিক নিরূপণ করতে পারছি না। আমার এই এতোদিনকার আশ্রম-জীবন কী অপেক্ষায় ছিল—এমনঃভাবে এমনি করে আমায় জ্ঞান-গৌরবের চাবি-কাঠিটি দেবে বলে ? কে জানে ?

গৌরব বোধ করা বাতুলতা মাত্র আমার পক্ষে।....আমি গৌরবের জন্যে করেছি কী ? আমি তো আশ্রম-জীবন যাপন করেও পার্থিব পৃথিবীরই মানুষ হয়ে পড়েছিলাম।....হয়তো বা পড়েও থাকতে হতো বর্তমান এই জীবনটির সবটুকু পরমায়ুর দিনগুলো নিয়ে নির্বোধের মত—প্রকৃত ভাবে অবুঝ হয়ে, অবুঝ থেকে।

ঃ আজও কিন্তু পুঁথি শুনতে হবে—

অনুরাগ-ব্যঞ্জনায় ভরা কোমল কণ্ঠে ডাক দিল মালা।····প্রেমে বধু হয়ে, সৌন্দর্যে নায়িকা হয়ে, বিরহ-মিলনের····আনন্দ-বিষাদের ····প্রতিটি রজনীর বাসর-আঙিনায় হাতছানি দিলে বুঝি।

ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে মালাকে দেখলাম।····মালার মধ্যে দেখতে পেলাম ঃ স্নেহে····মমতায়····মাতা হয়েও সে দণ্ডায়মান।

—সৌন্দর্যে নায়িকা-মনটিতেই আমি জড়িয়ে গেলাম।

বললাম ঃ শুনবে ?

উত্তর এলো ঃ শুনবো ····কিন্তু 'পিছলিয়ে' গেল না মালা। তার আয়ত-চোখে আমিই আট্‌কা পড়ে থাকলাম।

ঃ শোনালেন না ?

ঐ আট্‌কা থেকেই যতটুকু পারলাম 'খুলে' এলাম আমি—

"মজ্জন রঞ্জন অঞ্জন মোহন
দীর্ঘ সুলোচনে সাজে ;
নাসিকা অগ্রে শোভিত গজমতি
বক্ষে যে বিরাজে ॥
কটিতটে নীলপট্ট নীবিবন্ধ সুশোভিত
বেণী রচিত কুচ ভারে
মল্লিকা-মাল প্রফুল্লিত বেষ্টিত
কুচপরি কুঙ্কুম সারে ॥
মণিময় ভূষণ শ্রবণোপরি লোলিত
মৃগমদ-তিলক সুনাসে।
ইন্দুমুখে চিবুকে নীলবিন্দু প্রকাশিত
শ্যামমন বন্ধ সেই ফাঁসে ॥
লীলাকমল যুগ কমলকরে সুশোভিত
তাম্বুলে লোহিত অধরে।

কঁপালে দৃগঞ্চলে বল্লী সুচিত্রিত
পদযুগে মহারব-সারে ।।”

ঃ ভাল বর্ণনা দিলেন তো!

মালা, তার 'আয়ত-চোখ' তুলে নিলে। হাসি-হাসি ঝরণা হয়ে ঝরতে লাগলো—

"প্রিয়ের সহিত কৌতুক রচিত
হাস পরিহাস সদা।
হিয়া হিয়া মিলি রঙ্গে রসকেলি
করয়ে হইয়া মুদা ।।
প্রিয়ে রতি যবে চাহে ধনী তবে
মুখ ঝাঁপে মুচকিয়া।
অভিলাষ মনে জানায় যতনে
স্বাভিযোগ প্রকাশিয়া ।।
রতিরসরঙ্গে মাতি প্রিয়সঙ্গে
বিহরে নিলাজ প্রায়।
বিপরীত রতি বিপরীত রীতি
করি প্রিয় সুখ দেয় ।।
মানিনী যখন হয়েন তখন
তাড়না ভর্ৎসনা করে।
ধীরাধীরা আর অধীরা প্রকার
আর ধীরা পরচারে ।।"

উসখুস করছিল মনটি আমার।....বারে বারে অর্চনার মুখে শুনে-শুনে প্রায় কণ্ঠস্থ হয়েই তো ছিল।....মালার মুখে ভরসা পেয়ে শুনিয়ে দিলাম সে-টি, মালাকে—

"হেথা হৈতে যাহ মিছে কেন রহ
চাতুরী করিয়া বাত।

তুমি যে আমার কেমন সুজন
সকলি হইনু জ্ঞাত ॥”

অপেক্ষা করলে না মালা। কাছে এলো।—ডাক দিলে।

আমরা দু'জনে বিপরীত রতিতে....ইন্দ্রিয় ভূমির সীমা পার হয়ে এক' হয়ে যেতে থাকলাম....'কাল'-কে অতিক্রম করে।

[দশ]

আচার্য জীবনানন্দ দেব এসে গেছেন।

সাথে এসেছে অর্চনা। অর্চনা, বর্তমানে গর্ভবতী।

আমি মালা, এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে আছি। পুঁথি-পাঠ অনেক দিন হলো বন্ধ রাখা আছে।

অর্চনা থাকে পূর্বের মত মালার সাথে, মালার ঘরে। তা বলে থেমে নেই আমার ওদের কাছে যাতায়াতটি।

না, ছাড়াছাড়ি হয়ে তো নেই। পূর্বেকার একা-একা আশ্রম জীবনে আমি ও মালা প্রায়ই যে কাছাকাছি থাকতাম, ও-তো সময়কে নিয়ে ব্যবহার করে জীবন লাভের জন্যে। কিছু একক সাধনাও বলে দিয়েছিল মালা।

হ্যাঁ, তাইতো!

আশ্রমে পৌঁছাবার পূর্বে সংবাদ দিয়েছিলেন আচার্যদেব

তখনই মালা জানিয়েছিল আমায়: আচার্যদেবের শিক্ষা-পদ্ধতি দেখলেন তো?

আমি হাঁ হয়ে থেকে মালার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে রইলাম।

মালা বুঝে ফেললে আমায়। বললে: আচার্যদেব তো ইচ্ছে করেই আমাদের দুজনকে রেখে বাইরে গেলেন! অবশ্য, আরও আরও একটি কারণও আছে তাঁর বাইরে যাওয়ার।

তখনও আমি পরিষ্কার হতে পারিনি। আমায় সে অবস্থায় রেখেই নিকট হয়ে একটি প্রণাম জানালে মালা। আমিও আদর জানালাম মালাকে।

আমার হাতটি টেনে নিয়ে একটু টান্ টান্ করে ধরে রইলো। এই যে দুজনে....দুজনের কাছে....গভীর ভাবে পরিচিত হলাম, আচার্যদেব আশ্রমে থাকলে পারতেন আপনি এতোখানি নিকট হতে?

: এক 'অনুভব' পরবর্তী অধ্যায়ে টেনে নিয়ে যায়।

অর্চনা বলে গেল।

আমরা তিনজনে এক জোট হয়ে আশ্রমের তুলসীকুঞ্জে বসে। আশ্রমের পরিবেশটি ভয়ানক মন ভোলানো কিন্তু! প্রথমবার যে আশ্রমে এসে আবার বাইরে চলে গিয়েছিলাম, সে সময় তো কয়েকটি আশ্রমেই দু-একদিন করে গিয়েছিলাম আমি। আচার্য-দেবের এই 'অমৃত-পীঠ' মনোমোহন সুরে বাস্তব-পরিবেশে পার্থিব-পৃথিবীর ওপরটাতে তরঙ্গ-শূন্য বৃহৎ দীঘিতে ভাসমান একটি ছোট্ট পারিজাত-নৌকোর মতো ভেসে আছে যেন....পাশের জলটাতে অ-নেকখানি ছায়া ফেলে।

'অমৃত-পীঠের' চারিপাশে সুদূর বিস্তারী ক্ষেত যা বর্ষা ঋতুতে চাষের পর কচি-কচি ধানে সবুজ, আবার শীত ঋতুতে হাজার সরষে ফুলের হলুদ রঙে সোনালী।

সামান্য দূরে বেণু-গঙ্গা বয়ে চলেছে। অতি খরস্রোতা একটি নদী। যখনই নদীর ধারে যাওয়া যাবে কুল-কুল শব্দের ঢেউভাঙ্গা আওয়াজ পাবে পথিক। কোনোকালে নাকি এক রসিক বৈষ্ণবীর ভজন-কুটীর ছিল এই নদীরই ধার করে পূবমুখো। সেই বৈষ্ণবীই নাম রাখে বেণু-গঙ্গা। বৈষ্ণবী নাকি নদীর দিকে চেয়ে থেকে বলতো: শুনতে পাও না তোমরা! আমার শ্যামের বাঁশীর শব্দ? এই কথাই মানুষ মুখে চলে আসছে বহুকাল হতে।

মালা বেশ হাসতে হাসতে বলে চললে: তোর সামনে তো এখন 'মস্ত-জগত': তাই 'অনুভব', 'পরবর্তী অধ্যায়'—এ সব ভাবনাগুলোতে গলে গলে তরল হচ্ছিস্—

অর্চনা বললে: সব সময় অত হাল্‌কা হোস কেন?

এবারেও হাসতে হাসতে বলে চললে মালা: ক'টা মাস রাগগুলোকে পিসী-বাড়ী পাঠিয়ে দে। নয়তো তোর পেটের ছেলে রাগী হবে দেখিস্—

আমাকে সম্ভবমত গম্ভীর হয়েই থাকতে হলো।

দশ-সংস্কারের কথা বোঝাচ্ছিলেন সেদিন আচার্যদেব।....সেই আলোচনাই হয়তো তুলতে চেয়েছিল অর্চনা: 'এক অনুভব' —পরবর্তী অধ্যায় টেনে নিয়ে যায়—।

(১) গর্ভাধান (২) পুংসবন (৩) সীমন্তোন্নয়ন (৪) জাতকর্ম (৫) নামকরণ (৬) অন্নপ্রাশন (৭) চূড়াকরণ (৮) উপনয়ন (৯) সমাবর্তন (১০) বিবাহ—এই দশবিধ সংস্কার।....আচার্যদেব বলে চলেছিলেন যখন, অনেকবার উত্তেজিত হয়ে উঠতেও দেখেছি তাঁকে। বার বার কয়েকটি কথাই বলছিলেন। বলছিলেন: আমাদের ঋষিরা প্রতিটি সমাজ-ব্যবস্থার রীতি-নীতিকে বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে মেপে-

মেপে—দেখে-দেখে—তবেই মানুষ-মণ্ডলীর অশেষ হিতার্থে ঐ সব ....শাস্ত্র করে লিখে রেখে গেছেন বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর এ... ...এান কালের মানুষরাই—কোনই মূল্য দিতে চায় না ... ... তাঁদের কাছে ঐ 'সব-শরণগুলো' কেবলই নাকি অহেতু ... .এ-ওতো একটি ভাববার কথা, ঋষির 'দৃষ্টি' কী আমরা ... ? না, পাওয়ার চেষ্টাতেও আছি ?

...মার কিন্তু বড্ড ভাল লাগছিল, যখন অর্চনাকে নিয়ে—

...নার তখন 'তৃতীয় মাস'।....প্রথমতঃ হোম করলেন আচার্য- ...সে অনুষ্ঠানে·আমিও ছিলাম, মালাও ছিল।

অর্চনার বরকে তো আনা-করিয়েছিলেন আগেই ভদ্রলোককে বললেন : তুমি অর্চনার পিছনে দাঁড়াও, স্কন্ধ স্পর্শ করো।........ ভদ্রলোক করলেন তাই।

—এরপর আচার্যদেব ভদ্রলোকের দক্ষিণ-কর দিয়ে অর্চনার নাভি স্পর্শ করালেন। ঐ ভাবেই তাঁকে রেখে, বললেন—মন্ত্র উচ্চারণ করো—

প্রজাপতিঋষি অনুষ্টুপ ছন্দ মিত্রাবরুণাশ্বিগ্নিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগ।

ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে।

(সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, অগ্নি ও বায়ু যেমন পুরুষ ; তোমার গর্ভেও সেইরূপ পুরুষের আবির্ভাব হউক।)

আমি তো শ্রুতিধর নই।—

সব মন্ত্র বলতে পারলাম না।....মাষকলাই, যব আরও কী সব অনুষ্ঠানের উপকরণ পাত্রে রাখা ছিল।....ও-গুলো নিয়ে অর্চনার

নাকে ছোঁয়ালেন। বোধ হয় গন্ধ নিল অর্চনা।····ও, মনে পড়ে গেল। ভুলেই গিয়েছিলাম।····ফলদ্বয়যুক্ত বটশুঙ্গা ছিল।

কার্যশেষে বলেও দিতেন: আয়ুর্বেদের মতে বটফলদ্বারা যোনি-দোষ নষ্ট হয়। আর বাকিগুলোর গর্ভরক্ষার বিশেষ শক্তি আছে। এই 'পুংসবন কর্ম' গর্ভাধানের দ্বিতীয় সংস্কার। গর্ভধারণের তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যে করতে হয়।

অর্চনার পর, আমাদের ঐ ভদ্রলোক, এঁকে নিয়ে খানিক হাসি-আনন্দও করেছিলাম আমি।

আমায়—এই ইঙ্গিতটি দিয়ে রেখেছিল মালা। মনোমালা।

বলেছিল: আরও একটু বেশী করে মিশুন না, আচার্যদেব যে ভূর্জ-পত্রটি দিয়েছেন ওদের—জেনে নিন না—কী লিখে দিয়েছিলেন!

ভূর্জ-পত্রের কথা জেনেছিলাম আমি।

আর, গম্ভীর হয়ে থাকার ইচ্ছাটি প্রশ্রয় পেল না আমার কাছে।

মালা তো আমারই। তাই, মালাকে খুসী করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। খুসী করতে বসলাম অর্চনাকে, ভূর্জ-পত্রের কথা দিয়ে—

আদর্শ গৃহী হও তোমরা; এ-ই আমি চাই। ঐ ভাবে জীবন যাপন করে····এই পার্থিব পৃথিবীতে একটি দৃষ্টান্ত রেখে যেও। ভাবী-কালের মানুষরা····তোমাদের কথা জীবনে অমৃত সঞ্চয়ের চেষ্টা করবে।

এবারে ফিরে তাকালাম অর্চনার দিকে।····তৃপ্তিতে ঝরে অর্চনা।

: সাংঘাতিক মানুষ তো আপনি? ভদ্রলোকের কাছে [illegible] দেবের উপদেশগুলো জেনে নিয়েছেন—

হাত জোড়া করে ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলাম শুধু।

মালা কিন্তু নেচে উঠলো দুষ্টামিতে। দুদিনের আলাপেই বরকে ভদ্রলোক ঠাওরে নিয়েছিস্। ছোটোলোকও তো হতে পারে—

আপন করবী হতে গন্ধ-রাজ ফুলটি সরিয়ে আনলো অর্চনা। ছুঁড়ে মারলে মালার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে।

ব্যথা বোধ করলাম আমি। মালার বুকে লাগলো না তো (?)

অর্চনা চলে গেছে।

তার ভাবী কর্তব্য অনেক....আচার্য জীবনানন্দ যুগের প্রবাহ প্রবণতার ঐশ্বর্যে সম-তাল-মাত্রা রেখে কীভাবে জীবনকে আদর্শ-ঘৃহী করে 'অমৃতে' রূপান্বিত করা যায়—সে সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান ইঙ্গিত-কথা অর্চনার মর্মে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

অর্চনা, আমায় খোলাখুলি কিছুই বলেনি যাবার বেলায়।

আমি যে তার বিনম্র অভিবাদন কুড়োতেই ব্যস্ত ছিলাম।

একটি কথা আমায় বলে গিয়েছে অর্চনা। বলেছে, দুঃখ-ব্যথা-সঙ্কট-সমস্যা....এ গুলোর মধ্য দিয়েই তো 'অমৃত' সঞ্চয়ের জন্য নিত্য একটু একটু করে অগ্রসর হতে হবে। তা বলে 'প্রাণ-পদার্থশূন্য' হয়ে কখনও কোনো কারণেও মনের মধ্য-স্তরে ফিরে আসবেন না। মন যেন সদাসর্বদাই 'উত্তম'-এর আসনে তোলা থাকে।

আমার সম্মুখেও জীবনের অনন্ত-প্রশস্ত-পথ খোলা আছে কর্তব্য। আছে ; জীবনকে 'অমৃতে' প্রতিষ্ঠিত করে তোলার সহায়তা-স্বরূপ—বহু উপদেশাবলী ধরা আছে। আমি পারবো তো ? এই জীবনেই সফলকাম হবো তো ?

: আচার্যদেব স্মরণ করেছেন আপনাকে—

মালার কথায় আমার ধ্যান ভঙ্গ হলো। সময় নিলেও ধীরে ধীরে ফিরে এলাম বাস্তবে। উঠে পড়লাম।

আমায় সামনে রেখে অনুসরণ করে চললো মালা। মালার প্রতিটি পদক্ষেপের মাত্রায় শুনতে পাচ্ছিলাম: সে-ও তার জীবন-ঐশ্বর্যের দুয়ারে কড়া পাহারা বসিয়ে দিয়েছে—আপনার মনটিকে।

দুজনেই একসাথে প্রণাম জানালাম।

আচার্যদেব বললেন: অনেক কথাই তো বলা হয়ে গেছে তোমাদের। আরও বেশী করে বার বার ঐ একই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। তোমরা 'অমৃতে' পুষ্ট হও।

এবারে আমায় কাছে ডাকলেন। সস্নেহে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ জানালেন। বললেন: মনের একটি প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত হয়েই রয়েছে। সে প্রশ্নটির উত্তর শোনবার জন্যে....তোমার মনো-ক্ষেত্র 'প্রস্তুত' ছিল না এতোদিন। তাই আমিও বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। এখন তুমি 'উর্বর'। শুনে নাও: ইচ্ছাময় মনের ভোগ তৃষ্ণা বহু। ঐ তৃষ্ণার পূর্তির জন্যে বহু জন্ম অতিক্রম করতে হয়। তখনই চৈতন্যমুখী হয় মানুষ। এরপরও অনেক 'স্তর' পেরোলে তবেই আসে 'মুমুক্ষত্ব'।....তুমি সৌভাগ্যবান। সে সব পথ ও পথের বাঁক অতিক্রম করে এসেছো। এখন 'আত্মসাক্ষাৎটুকু' বাকী কেবল। ....তোমার জন্মান্তরের কর্ম ও সংস্কার অনুযায়ী সে পথের সহায় হবে মালা। মালারও জন্মান্তরের কর্ম ও সংস্কার অনুযায়ী....তার 'প্রাপ্তি'র পথের সহায়ক হবে তুমি।....তোমার পুরুষভাবের প্রাবল্যের জন্যেই, ঈশ্বর নির্দিষ্ট এই মিলন।....আমি নিমিত্ত মাত্র।....পুরুষ শরীরে সৃষ্টির বীজ থাকে, আর প্রাণের সাথে যুক্ত—ঐ সৃষ্টি প্রবৃত্তি। ঐ প্রাণ থেকেই তো প্রাণ সঞ্চার হয় সৃষ্ট জীবের।....প্রাণের সাথে এই ভাবের নিত্য-সম্বন্ধ বলে, ঐ 'সংস্কার' প্রাণ ত্যাগ পর্যন্তই থাকে।....আশা

করি এ বিষয়ে আর অধিক বলতে হবে না তোমায়। তুমি উপলব্ধিতে এসে গেছ।

স্থির হয়ে একাসনে বহু সময় বসে রইলেন আচার্যদেব।····এরপর আসনের পাশ হতে একটি ভূর্জ-পত্র নিয়ে মালাকে ডাকলেন। মালা কাছে এলো। বললেন : তোমরা এক হও দুজনে।

····আমরা হলাম।

—আমার সমাধির সময় এসে গেছে। সমাধি নিলে, সমাধি বেদীতে এই ভূর্জ-পত্রের লেখাটুকু—লিখে দিও।

আমরা হাত বাড়ালাম। আমাদের অচঞ্চল হাতে তুলে দিলেন ভূর্জ-পত্রটি।

আমি ও মালা পড়তে লাগলাম : আমরা যদি এমন কথা বলি যে তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাবো, বাইরের কর্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব—কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করবো, বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করবো না—কিংবা একেবারে এর উল্টো কথাই বলি এবং এই বলে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল একদিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি, তা হলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

(রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীভগবান সবার মঙ্গল করুন, এই প্রার্থনা। ওঁ শান্তি।

সম্পূর্ণ